ISSN 1605-7023

চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ১৩৪৩
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪২০

সম্পাদনা পর্ষদ

এ. কে. এম. আবদুল আউয়াল মজুমদার	চেয়ারম্যান
এ, এস, শামীম আহমেদ	সদস্য
ফেরদৌস আখতার	সদস্য
ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান	সদস্য
মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি	সদস্য
কঙ্কা জামিল	সদস্যা
মোঃ সোহেল ইমাম খান	সদস্য

সম্পাদক : কাবেদুল ইসলাম

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ১৩৪৩
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক ১৪২০
Bangladesh Lok-Prashashan Patrika, 14th Year Issue, Kartik 1420
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৪৫০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www.bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ-এর ঠিকানা

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : আর. জে. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৮/১, নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৩৩৭৫৪৯, ০১৭১৩০৪২৬৩৪
ই-মেইল : rj_printing@yahoo.com

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকায় প্রকাশিত/বিধৃত প্রবন্ধসমূহে মতামত প্রবন্ধকার-লেখকদের সম্পূর্ণ নিজস্ব; এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোনোরূপ দায়-দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

সুলতানি আমলে বাংলার বাসগৃহ ও বাস্তুপরিবেশ ১
ড. মো. ওসমান গনী

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ১৭
প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী

ঘুষের লেনদেন : ভঙ্গিমা ও পরিভাষা ২৯
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: তাত্ত্বিক এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ৪৩
মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান

Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, 1973 — একটি পর্যালোচনা ৫৯
মুঃ আবদুল হাকিম

বাংলাদেশে ফুল ব্যবসা : চট্টগ্রামের উপর একটি সমীক্ষা ৭৩
মুন্সি তানিয়া আফছার

শমসের গাজী (১৭০৬-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ): মধ্যযুগের এক কিংবদন্তী শাসক ১০১
এ, কে, এম, আবদুল আউয়াল মজুমদার

মোগল বাংলার রাজধানী ঢাকা : পূর্বাপর ১১৫
কাবেদুল ইসলাম

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

সুলতানি আমলে বাংলার বাসগৃহ ও বাস্তুপরিবেশ

*ড. মো. ওসমান গনী**

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ মানুষের অন্যতম প্রয়োজন হলো বাসগৃহ। একটি অঞ্চলের আবহাওয়া ও উপকরণের সহজলভ্যতা বাসগৃহের গড়ন ও বাস্তুপরিবেশ রচনায় প্রভাব বিস্তার করে। অনুরূপভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা সুস্পষ্ট প্রভাব বজায় রাখে। সুলতান-শাসক-অভিজাতদের বাসগৃহ নির্মাণে পলিমাটি দ্বারা তৈরী পোড়ানো ইট, কাঠ, পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে। দরিদ্রদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সাদামাটা উপকরণের ব্যবহার হয়েছে। কাঠ, বাঁশ, কাদা-মাটি, খড়, গোলপাতা, তালপাতা ও খেজুরপাতার আচ্ছাদনে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরের ঘর তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উভয় ধরনের বাসগৃহের মধ্যে নির্মাণশৈলী ও বাস্তুগত পরিবেশ বিবেচনায় বড় ধরনের পার্থক্য ছিল না। 'চালাশৈলীর' ব্যবহার তার প্রমাণ বহন করে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা–স্থানীয় উপকরণ ও আবহাওয়া প্রভাবজ ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন ও সমকালীন বাংলাসাহিত্য, পর্যটকদের বিবরণী ও প্রত্নসাক্ষ্যের আলোকে সুলতানি বাংলার বাসগৃহ ও বাস্তুপরিবেশ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার জলবায়ু ও বাস্তুসামগ্রীর লভ্যতা

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বাংলার আবহাওয়া খুবই আর্দ্র। বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। ফলে বিশেষ করে বর্ষাঋতুতে বাসোপযোগী বাসগৃহ এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে ছাদের পানি সহজে নীচে গড়িয়ে পড়তে পারে। একারণে ছাদ ঢালু করা হয়। ঢালু ছাদ সৃষ্টির মূলে সহজলভ্য কাদা-মাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলে রয়েছে অজস্র পলিমাটি। সহজলভ্য এই পলিমাটি দিয়ে রৌদ্রে পোড়া ইট দ্বারা যেমন তৈরি হয়েছে অট্টালিকা, তেমনি তৈরি হয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় জন্মানো অসংখ্য বাঁশের তৈরী ঘরবাড়ি।

গ্রীষ্মমণ্ডলে বাঁশই গৃহনির্মাণের উপকরণ হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয়, সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়বহুল। চালাঘরের প্রধান উপকরণ হিসেবে বাঁশ অপরিহার্য। আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রকৃতির চমৎকার উপহার বাঁশের বিভিন্ন জাতের কথা আমরা জানতে পাই।[১] এ সমস্ত বাঁশ খুঁটি, ভারআড়া, পাড়, ঠেকনা, ছাদের কাঠামো ও বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত

*সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর।

হওয়ার কথা জানা যায়। বাঁশের কাঠামোর উপর বিভিন্ন ধরনের খড়, তালপাতা, গোলপাতা, খেজুরপাতা প্রভৃতি বিছিয়ে চালা তৈরি করা হতো। কিছু কিছু এলাকায় খড় বা পাতা ছাউনির পরিবর্তে মাটির খোলা বা টালি ব্যবহারের কথা জানা যায়।[২]

সমকালীন বাংলায় বিভিন্ন ধরনের চালাঘরের উল্লেখ আছে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একচালা বা ছেপড়াচালা, দোচালা বা বাংলাঘরের প্রচলন ছিল। ধনবান লোকেরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চারচালা, আটচালা ও বারোচালা ঘর তৈরি করত। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচলিত ছিল বারদুয়ারী বা বারবাংলা ঘর। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য এ ধরনের চালাঘর খুবই উপযুক্ত ছিল। বাঁকানো বাঁশ দিয়ে প্রস্তুত কার্নিশযুক্ত খড়ের ছাউনির কুটির 'চালাশৈলী' নামে পরিচিত। এই চালাশৈলীর অনুকরণে আমরা কাঠ ও ইটের বাড়ির ছাদ দেখতে পাই। বাংলার কুঁড়েঘরের আদর্শ প্রাচীনকালের সারনাথের শুঙ্গস্তম্ভে জোড়বাংলার নকশায় পরিদৃষ্ট হয়।[৩]

মুসলমানদের আগমনের ফলে গৃহ ও সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটো উন্নততর প্রযুক্তির সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। এ দুটো প্রযুক্তি হলো: কংক্রিট (চুন, বালি, সুরকি ও পাথরকুচি প্রভৃতি মিশ্রিত পিণ্ড) এবং মর্টার (চুন, বালি ও জলমিশ্রিত সংযুক্তিকরণ মশলা বা পলেস্তারা)[৪]। কংক্রিট ও মর্টারের ব্যবহার বাংলার সংযুক্তিকরণ মসলার জোরেই মুসলমানদের পক্ষে প্রকৃত খিলান ও গম্বুজের সাহায্যে বড় এলাকা জুড়ে বিশাল সৌধ নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। ক্রমশ সৌধগুলি আড়ম্বরপূর্ণ ও মহিমান্বিত রূপ নেয়, যা আগে কখনও এদেশে দেখা যায়নি।

কতিপয় সুলতানের প্রাসাদ

সুলতান ও অভিজাতবর্গ ঐ ধরনের প্রাসাদে বসবাস করতেন। সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে আগত চৈনিক দূতগণ ইট ও সুরকির গাঁথুনিতে তৈরী নয়নাভিরাম রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, 'যে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে উঠতে হয় তা উঁচু আর চওড়া। ভিতরের দিকটা চুনকাম করা। প্রাসাদটিতে নয়টি মহল এবং তিনটি দরজা আছে। থামগুলি পিতলের রং-এর এবং পালিশ করা। গায়ে নানারকম ফুল ও জীবজন্তুর ছবি খোদাই করা ছিল। ডাইনে এবং বামে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বারান্দা আছে। উক্ত বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, দালানগুলি উঁচু ও প্রশস্ত। রাজপ্রাসাদের ছাদ চ্যাপ্টা, চতুষ্কোণ ও সাদা ধবধবে।'[৫]

সুলতান বারবক শাহের আমলে এ ধরনের নয় মহলা সুরম্য প্রাসাদের উল্লেখ আছে। সৌন্দর্যরসিক বারবক শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদটির গাঁয়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি[৬] সূত্রে জানা যায়, প্রাসাদটির মধ্যে উদ্যানের মতো একটি স্তম্ভ ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করত। এর নীচ দিয়ে একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হতো। প্রাসাদটিতে 'মধ্য তোরণ' নামে একটি অপূর্ব সুন্দর বিশেষ প্রবেশ

পথ হিসেবে নির্মিত তোরণ ছিল। এই প্রাসাদের নয়টি কক্ষ অতিক্রম করে কৃত্তিবাস রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন।[৭]

সে আমলের আরও গগনভেদী সৌকর্যময় প্রাসাদের কথা জানা যায়। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জ্যো আঁ- দ্য- বারোস (১৬শ শতাব্দী)-এর গ্রন্থসূত্রে আমরা সমকালীন বাংলার সুলতান ও আমির-ওমরাহ্দের নয়নাভিরাম হর্ম্যরাজি সম্পর্কে অবগত হই। গৌড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'এই শহরের একটি বড় অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি। স্বর্ণ-মণিমুক্তামণ্ডিত ঘরের উল্লেখ আছে'।[৮] সেকালে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বেহেস্ত ও মে. বেহেস্তে হুরিদের বাস এবং অতুলনীয় বিলাসবহুল প্রাসাদাবলির প্রাচুর্য। প্রতিটি প্রাসাদ-উদ্যানের উচ্ছলিত ফোয়ারার লাস্যে চোখ জুড়াত। চন্দন কাঠ দিয়ে বাড়ির থাম বসানো হতো। চিনদেশের টালি দিয়ে মেঝে ও ঘরের দেওয়াল তৈরি হতো। ফলের কেয়ারি ও পাথরের জল সেচনালি বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত।[৯]

উপরে বর্ণিত প্রাসাদগুলো মূল্যবান ইট ও পাথরের সমাহারে নির্মিত হওয়ার কথা জানা যায়। একটি গ্রন্থে হীরা-মণি-মাণিক্য ও অন্যান্য রত্নখচিত প্রাসাদের উল্লেখও আছে। বহুবর্ণিল চিত্রে সুশোভিত সাতমহলা প্রাসাদের সৌকর্য-সুষমায় 'চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা মনে হয়'।[১০] আব্দুল হাকিমের *'লালমতি-সয়ফুলমূলক'* কাব্যে একটি রাজপ্রাসাদের বর্ণনা মেলে।[১১] তাতে অমূল্য মরকতের সিঁড়ি আর হীরা-মাণিক্যের বেড়ায় কবি যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন তার সবটুকু সত্য না হলেও তাতে তৎকালীন সমাজের ধনিক ও অভিজাত শ্রেণির মানুষের জাঁকজমকের চিত্র ফুটে উঠেছে।[১২]

নদীবহুল বাংলার বাস্তুপরিকল্পনায় সুলতানদের প্রাসাদ-অট্টালিকারাজি কুলকুল রবে বহে যাওয়া নদীর ধারেই যে স্থান পেত, তা রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ও নসরত শাহের প্রাসাদের বর্ণনাদৃষ্টে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নদীর জলে প্রাসাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হতো এবং রাতে তার ছায়া পড়ত। প্রাকৃতিক মাধুর্যের ছোঁয়ায় প্রাসাদ যেন আরও মোহময়ী হয়ে উঠত। বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত এ প্রাসাদে থাকত অসংখ্য দরজা, কক্ষ ও খেলার মাঠ।[১৩] চওড়া মাঠে বারো জন অশ্বারোহীর পোলো খেলার কথা জানা যায়। প্রাসাদ ঘিরে বহুবর্ণিল ফুলে সুরভিত উদ্যান শোভা পেত। এছাড়াও ছিল প্রাসাদের চারপাশে প্রচুর খোলা জায়গা। সুলতানদের রাজপ্রাসাদের অনুরূপ অভিজাত ও বিত্তবানরা তাঁদের বাসগৃহ নির্মাণ করতেন। কে. এম. (কুনওয়ার মুহম্মদ) আশরাফের ধারণা, সুলতানদের তুলনায় অভিজাতদের জীবনে বিপদ ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা ছিল কম, কিন্তু তাদের আর্থিক প্রাচুর্য ছিল। তাই অভিজাতদের গৃহ পরিমণ্ডলে শান্তি ও বিশ্রান্তির স্নিগ্ধতা ছিল বেশী। সেখানে সমতল ছাদবিশিষ্ট ইটের দালান, সিঁড়ি ও গৃহসংযুক্ত স্নানাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪]

বংশীদাস রায়ের *'পদ্মপুরাণে'* আমরা শিবপুরীর বিবরণ পাই।[১৫] তাতে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সমাজে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ যে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ গৃহে বাস করতেন তাতে সন্দেহ করার অবকাশ কম।

বাস্তুপরিবেশ ও রকমফের

প্রাচীন আমলে বাংলার চুনকাম করা ধবলগৃহ ও দেউলের কথা জানা যায়। সে ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল বলে মনে হয়। সুলতানি আমলে খোদাই করা কাঠের দরজায় শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজের স্বাক্ষর থাকত। গৃহের সদর দরজায় 'হরিমুখ' (সিংহমুখ) শোভা পেত।[১৬] প্রাসাদসমূহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অভিজাত ও ধনবানদের বাসগৃহ এলাকায় নৈসর্গিক পরিবেশ বিরাজ করত। বাসগৃহ সংলগ্ন ফুল ও ফলের বাগান থাকত।[১৭]

বাগানের মতো বাসগৃহের একধারে পরিখা বা পুকুর থাকত। প্রাচীন আমলে বাংলায় গৃহসংলগ্ন জলাধার বা পুকুরের চল ছিল। সুলতানিযুগেও সচ্ছল গৃহস্থরা পারিবারিক প্রয়োজনে অন্তঃপুরে পুকুর কাটত এবং তার চারদিকে ঘাট নির্মাণ করত।[১৮] সুলতানি বাংলার বাস্তুপরিকল্পনায় এটি একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। সমতটের নদীবহুল অঞ্চলে নৌযাত্রা প্রশস্ততর ছিল বলে সেখানে বাড়িসংলগ্ন পুকুরের সঙ্গে খালের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো।[১৯] যাতায়াত ছাড়া স্নানের প্রয়োজনে এ সমস্ত পুকুর ব্যবহৃত হতো । অনেকে পুকুর থেকে পানীয়জল সংগ্রহ করত। কেউ কারো পুকুরে যেত না। এতে প্রতীয়মান হয়, তখন প্রায় সকলের বাড়িসংলগ্ন পুকুর বা খাল ছিল।

সেকালের অভিজাত ও ধনবানরা টুঙ্গী (উচ্চ হাওয়াখানা) ঘরে বসবাস করতেন।[২০] চালাঘরের অনুকরণে এ সমস্ত গৃহ নির্মিত হতো। টুঙ্গী ঘর সাধারণত আটচালার অনুরূপ ছিল। প্রসঙ্গত কাজলরেখার পালাতে আমরা 'কামটুঙ্গী' ও 'জলটুঙ্গীর' কথা জানতে পারি। কামটুঙ্গী উঁচুভিটিতে বা পুকুর পাড়ে নির্মিত হতো। নববিবাহিত দম্পতিদের রাত্রিনিবাস হিসেবে কামটুঙ্গীর বহুল প্রচলন ছিল। একটি কাব্যে এটি 'উদয়মঙ্গল' নামে আখ্যায়িত হয়েছে।[২১]

'জলটুঙ্গী' দীঘি বা পুকুরের মধ্যে নানারূপ কলা শিল্পমণ্ডিত হয়ে জলের উপর জলপত্রের মত উঁচু হয়ে থাকত। চারদিকে কুমুদ ও পদ্মফুল ফুটত। তার গন্ধে সুবাসিত বায়ু গৃহে প্রবেশ করে গৃহীর অঙ্গ পুলকিত করত। প্রাচীন আমলে সুইজারল্যান্ডের জলের উপর এ ধরনের ঘরের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[২২] মুন্সীগঞ্জের টুঙ্গীবাড়ি ও গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া আজও অতীত বাংলার টুঙ্গীঘরের স্মৃতি বহন করছে। *'মনসামঙ্গল'* কাব্যে সাহুবেনের স্ত্রী অমলার সুদৃশ্য ও অলঙ্কৃত গৃহের উল্লেখ আছে। এ ধরনের সুরম্য বাসগৃহ সেকালে 'উদয়তারা' নামে পরিচিত ছিল।[২৩] আমাদের ধারণা, সম্ভবত রাজস্থানের উদয়পুরের গৃহকে আদর্শ করে 'ইউসুফ

জোলেখা' ও '*মনসামঙ্গল*' কাব্যে যথাক্রমে 'উদয়মঙ্গল' ও 'উদয়দতারা' নামকরণ করা হয়েছে।

উচ্চবিত্ত এবং ধনবান বণিক শ্রেণীর মানুষদের অজস্র অর্থব্যয়ে বাঁশ-খড়ে নির্মিত ঘরে বসবাসের বাতিক ছিল। তাদের বসতবাড়ি বাঁশের তৈরি এবং সেগুলোর কোনো কোনোটি এমনভাবে নির্মিত হতো যে একটি বসতবাড়ি নির্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকারও বেশি খরচ হতো।[২৪] মুঘল আমলেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। মির্জা নাথান যশোর জয় করার পর তেতলাবিশিষ্ট সুপারিগাছের বাংলাঘর তৈরি করেছিলেন। যশোরের খগরঘাটায় মুঘল আমলে গৃহনির্মাণের এ ধারা অব্যাহত ছিল। বাদশাহি কর্মচারীরা এক হাজার পাঁচ শত টাকা খরচ করে এক একটি বাংলো নির্মাণ করত।[২৫] খড়ের তৈরী এমনি ধরনের ঘর নির্মাণে বারো হাজার টাকা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হতো।[২৬] এসব ঘর টিকতও দীর্ঘদিন ।

এসব গৃহ প্রায়ই চারচালা বা আটচালা বিশিষ্ট হতো। অবস্থাপন্ন লোকেরা সাধারণত আটচালা ঘরে বসবাস করত। বাংলাঘর দোচালা ও বারোচালা হতো। এগুলো বক্রাকার কার্নিশসহ খড়ের ছাউনি দেওয়া চালা ঘরের ছিল। বণিকরাজ মুরাই নির্মাণ করেছিলেন 'বড় বড় ঘর তার চারচালা আটচালা'।[২৭] বাঁশ ও কাঠের নির্মিত এসমস্ত চালাঘর হতো অসাধারণ কারুকার্যখচিত। গৃহের কড়ি-বর্গা খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো হতো। ছাদ মোড়ানো হতো মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণ পত্রে। স্থানে স্থানে অভ্র পাতের প্রলেপ থাকত। কোনো কোনো ছাদ মাছরাঙ্গা পাখি ও ময়ূরের পালকে আবৃত হয়ে সূর্যকিরণে ঝলমল করত।[২৮] সম্ভবত এ কারণে সেকালে মাছরাঙ্গা পাখির পালক বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছিল। বাংলার অনুকরণে চিন দেশেও মাছরাঙ্গা পাখির পালক দিয়ে ঘরের ছাদ সাজানো হতো।[২৯]

বস্তুত সেসময়ে বাংলাঘর অভিজাত ও উচ্চবিত্তদের নিকট দারুণভাবে সমাদর লাভ করে। উলুছনের ছাউনি ও সুন্দিবেতের বেড়াযুক্ত বাংলাঘর খুবই জনপ্রিয় ছিল। এসকল ঘর অধিকাংশ চৌচালা ও আটচালা বিশিষ্ট হতো।[৩০] বহিরাগত পর্তুগীজরাও দেশীয় রীতির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়ি-ঘর বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি করেছিল। [৩১]

দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা গ্রামে বাস করত। তাদের ঘর-বাড়ি কাঠ, বাঁশ, কাদামাটি, তালপাতা আর খাড়ের ছাউনির হতো। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর একটি শ্লোকে উল্লেখ আছ: 'কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেওয়াল গড়িয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে, কেঁচোর সন্ধানে নিয়ত ব্যাঙের দ্বারা আমার গৃহ আকীর্ণ'।[৩২] চর্যাগানেও আমরা সমকালীন বাংলার বসতি ও বাসগৃহের ইঙ্গিত পাই। তাতে কুঁড়েঘরের উল্লেখ আছে।[৩৩] দরিদ্র মানুষদের ঘরের ছাউনি খড়ের হতো।[৩৪]

দোকানপাট, মাদ্রাসা নির্মাণে খড়ই ছিল অন্যতম উপাদান।[৩৫] এসকল ঘর অপরিসর ও ক্ষুদ্রাকার হতো।[৩৬] সাধারণ মানুষের গৃহ ব্যাধ ও কালকেতুর গৃহের মতই অতি সাধারণ ছিল। তালপাতার ছাউনি ও ভেরেন্ডার খুঁটি দ্বারা নির্মিত কুঁড়েঘরে ছিল তাদের বাস।[৩৭] আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সেকালে তালপাতা, গোলপাতা, উলুছন ও হোগলাপাতার ছাউনির প্রচলন ছিল। এগুলো এত দুর্বল ছিল যে অল্প বাতাসে উড়ে যেত।

ঘরের উপরে খড় অথবা খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া হতো। শীতলপাটি দিয়েও ঘরের বেড়া তৈরির কথা জানা যায়। সুন্দিবেত ও নলখাগড়ার বেড়ারও প্রচলন ছিল। অনেকে আবার পাটকাঠি দিয়ে ঘরের বেড়ার কাজ করত। বাংলার বাইরেও পাটকাঠির বেড়ার প্রচলন ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যান্ডের মাউরীরা পাটকাঠির বেড়া বানাত। তারা পাটকাঠির বেড়ায় কাদা মাখানোর পর শুকিয়ে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করত।[৩৮] সমকালীন বাংলায় কঞ্চি ও চাটাই-এর বেড়া কাদার প্রলেপ দিয়ে বানানোর উল্লেখ আছে।[৩৯] এসমস্ত ঘরে সাধারণত জানালার ব্যবস্থা থাকত না। ফলে বেড়া ভেদ করে ঘরের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করত। আজও বাংলাদেশে এ ধরনের ছোট ঘরের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

ঘরের বেড়া হিসেবে কোনো কোনো এলাকায় কাদামাটির দেয়াল দেওয়া হতো। সতেরো শতকে বাংলার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে মাটি দিয়ে তৈরী বাড়ি-ঘরের বহুল প্রচলন ছিল। পর্যটক ট্যাভারনিয়ের-এর বর্ণনা এসম্পর্কে আলোকপাত করে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সুবাদারের আবাসটি উঁচু দেওয়াল ঘেরা ছিল।[৪০] দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেন যে, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল যেখানে পাহাড়ি মাটি শক্ত সেখানে মাটির সুন্দর সুন্দর ঘর নির্মিত হতো।[৪১] সতেরো শতকের শুরুতে ইসলাম খান তাঁর সুবাহকে শক্তিশালী করার জন্য ঘোড়াঘাটে আগমন করেন। সে কারণে বহু বাড়ি-ঘর নির্মিত হয়েছিল। এসমস্ত এলাকায় সুলতানি আমলের অসংখ্য মাটির দুর্গ দৃষ্টে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেসমস্ত বাড়ি-ঘর মাটির দেয়ালের তৈরি ছিল। মাটির তৈরি ঘরগুলোর ছাদে ছাউনি থাকত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে খড়ের পরিবর্তে টালিসদৃশ এক ধরনের খোলা ব্যবহার করা হতো বলে জানা যায়। অনেকে দেয়ালে চুনকাম করত।

সুলতানি আমলে বাংলায় কোঠাঘরের প্রচলন ছিল। খড়ের চালের নীচে মাটির সমান্তরাল ছাদ থাকত। কোঠাঘরে সাধারণত একটি মাত্র দরজা দেওয়া হতো। ইটনির্মিত কোঠাঘর নির্মাণের রীতি ছিল। নগরের লোকেরা অবশ্য ইট দিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করত। সেকালে কাঠের ঘরের প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে কাঠ দিয়ে খুঁটি-বর্গা তৈরি হতো। ফিরুজশাহ তুগলক দ্বিতীয়বার একডালা দুর্গ অবরোধকালে অস্থায়ী আবাস হিসেবে বহু কাঠের ঘর নির্মাণ করেছিলেন।[৪২] বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত এলাকায় কাঠের ঘরের বেশ প্রচলন

ছিল। কাঠের সুলভতা ও আরাকানের গৃহ নির্মাণের প্রভাবেই সম্ভবত ঐ অঞ্চলে কাঠের ঘর নির্মিত হতো।

প্রাচীন আমলের ধারা অনুসরণ করে বাংলায় চতুষ্কোণাকারে ঘর নির্মিত হতো। চতুষ্কোণাকৃতির ঘর ছাড়া তখন অর্দ্ধবৃত্তাকার চালাবিশিষ্ট দোচালা ঘরেরও প্রচলন ছিল। এ ধরনের ঘরকে 'জুইতের ঘর' বলা হতো। এই শ্রেণীর ঘরের চালে এত বেশি বাঁক দেওয়া হতো যে, চালের নীচের দিকের কোণগুলো একেবারে ভিতরে এসে যেত। ঘরের মটকা বহু উঁচুতে থাকত। গালা বা লাক্ষা দিয়ে জৌঘর নির্মাণ করা হতো। 'জৌঘর' শব্দটি জতুগৃহ থেকে জাত। মহাভারতের আদিপর্বে জতুগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৩] এক সময়ে সম্ভবত জহরব্রত পালনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ঘর নির্মিত হতো। আমাদের ধারণা, প্রাচীন কালের জতু বা জৌগৃহ আলোচ্যযুগে জুইত বা পছন্দের গৃহে রূপান্তর লাভ করে।[৪৪]

বসতির আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে তিন ধরনের বসতি ছিল। যেমন–বিক্ষিপ্ত, সারিবদ্ধ ও অনুকেন্দ্রিক।[৪৫] তবে মনে হয়, অধিকাংশ লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। সীমিত পরিসরে এক খণ্ড জমিতে মাটি তুলে ভিটে তৈরি করত। মাটি দলে পিষে মেঝে তৈরি হতো। কখনও মাটির মেঝের উপর গোবরের পলেস্তারা পড়ত। এভাবে বাড়ি তৈরি করা হতো। এসমস্ত বাড়ি-ঘর শীতের তীব্রতা, গ্রীষ্মের দাবদাহ ও বর্ষার প্রচণ্ডতার হাত থেকে বাঁচার জন্য ন্যূনপক্ষে যা দরকার ছিল, সেসব উপাদানের সাহায্যে নির্মিত হতো।[৪৬]

দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বাড়ি অনেক ছোট এবং কম শক্ত ছিল। এদের ঘরের সংখ্যাও খুব কম হতো। বলা যায়, দরিদ্র লোকদের সাকুল্যে একখানি ঘরই ছিল সম্বল। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে হরিহোরের বাড়ির বর্ণনা মেলে। তাতে দেখতে পাই, 'ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাতে'। অর্থাৎ মাত্র একখানি ঘর, যেখানে মাতা-পিতা থাকে।[৪৭] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এসমস্ত বাড়িতে জানালা থাকত না। বেড়া ভেদ করে প্রয়োজনীয় আলো বাতাস প্রবেশ করত। বাড়ির সামনের দেওয়াল বা বেড়ায় খানিকটা ফাঁকা রাখা হতো। ঐ ফাঁকটিই ছিল প্রবেশ পথ।[৪৮]

অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ির আকার বড় ছিল। তাতে তিনটি হতে পাঁচটি ঘর থাকত।[৪৯] সাধারণত বাড়িটি কয়েকটি অংশে ভাগ করা হতো। চমৎকার চত্বরসংলগ্ন শয়নকক্ষ, প্রক্ষিপ্ত বারান্দাসহ বসার ঘর, রান্নাঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের ব্যবস্থা থাকত।[৫০] বস্তুত বাড়ির বিভিন্ন অংশের বিন্যাস চমৎকার সৌন্দর্যবোধ ও শিষ্টাচারের পরিচয় বহন করত। চূড়ামণিদাস বর্ণিত চৈতন্যের বাসগৃহে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন, 'চমৎকার বাড়িটির একটি দরজা দক্ষিণে, একটি পূর্বদিকে। পূর্বদিকের দরজার পরে একটি পরিশীলিত অঙ্গন'।[৫১]

সেকালে বাড়ির ভিতরের কক্ষাদির নামকরণ করা হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যেমন– 'হাতিনা', 'পিঁড়া' ও 'আওলা'। ঘরের প্রবেশ কক্ষ হাতিনা, মধ্যকক্ষ পিঁড়া (Inner appartment) ও পেছনের শেষ কক্ষ 'আওলা' নামে পরিচিত ছিল।[৫২] এতে অনুমিত হয়, সেকালে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট চারচালা বা আটচালা ঘর তৈরি হতো। একটি কাব্যসূত্রে বাসগৃহের বিভিন্ন অংশের কথা জানা যায়। সেখানে উল্লেখ আছে– 'পাঁচখণ্ড বাড়ি তার সোনাতে বান্ধিয়া'। প্রসঙ্গত সদরবাড়ি, অন্দরবাড়ি, পূজাবাড়ি, রান্নাবাড়ি ও গোহালবাড়িকে নিয়ে পাঁচখণ্ড বাড়ির কথা বলা হয়েছে।[৫৩]

বাসগৃহের প্রাচীরের ভিতর আঙ্গিনা ও প্রাঙ্গণ সীমায় সদর দরজা থাকত।[৫৪] সুকুমার সেনের ধারণা, সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ি সদর ও অন্দর মহলে বিভক্ত ছিল। সদর মহলে বিভিন্ন কাজকর্ম হতো। রন্ধনশালা অন্দরমহলের মধ্যে থাকত। এছাড়া অন্দরমহলের 'আচপনশাইল' (মুখ-হাতে ধোওয়ার ঘর) নামে একটি ঘর সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[৫৫] সদর মহলের সামনে অঙ্গন বা উঠান থাকত। জমির ফসল এখানে আনা হতো।[৫৬] হিন্দু সমাজের পবিত্রতার প্রতীক গোবর দিয়ে ঘর ও উঠানের মেঝে নিকানো হতো। ভার্থেমার (১৬শ শতাব্দী) বিবরণে বাড়িতে মহিলাদের ঘন ঘন এ কাজ করার উল্লেখ মেলে।[৫৭]

প্রাক-সুলতানি আমলে উপকারিকা বা উয়ারি নামধেয় এক ধরনের ঘরের কথা জানা যায়।[৫৮] এটি সদর মহলের অন্তর্ভুক্ত একটি ঘর যেখানে বাইরের কাজকর্ম হতো। উয়ারির বিপরীতে আমরা মণ্ডপের কথা জানতে পাই। এটিও সদর মহলের অর্থাৎ বাড়ির বাইরের একটি ঘর।[৫৯] পূজা অথবা সাময়িক প্রয়োজনে সমবেত লোকদের আশ্রয়ের জন্য মণ্ডপের কথা জানতে পাই। অভ্যাগত অতিথিদেরকে মণ্ডপে বসতে দেওয়া হতো। মণ্ডপের চারদিকে কোনো বেষ্টনী দেয়াল বা বেড়া থাকত না। খুঁটির ওপর থাকত খড়ের চাল। এগুলো আয়তন অনুসারে চারচালা বা আটচালা হতো। প্রাচীন আমলে ধনবান ও সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতেও মণ্ডপের বহুল প্রচলন ছিল। সৌহাগৌর প্রত্নফলকের শীর্ষে অঙ্কিত একটি আটচালা মণ্ডপের চিত্র দৃষ্টে তা আমরা জানতে পাই।[৬০]

উপর্যুক্ত সাধারণ মণ্ডপ ছাড়াও বড়লোকদের বাড়িতে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশালা ও পৃথক অতিথিশালা স্থাপিত হতো।[৬১] প্রবাসীদের ব্যবহারের জন্য 'দীঘল মন্দির' থাকত।[৬২] বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্য থেকে জানা যায়, রাস্তাঘাটে অথবা জঙ্গলের ধারেও পূজার ঘর নির্মিত হতো।

মণ্ডপ, অতিথিশালা বা উয়ারির বিপরীতে মুসলমানদের বাড়িতে বৈঠকখানার সংস্থান থাকত। 'বৈঠক' শব্দটি ফার্সি ভাষার।[৬৩] সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে,

বিশেষ ধরনের এই ঘরটির প্রচলন ইতিপূর্বে এদেশে ছিল না। মুসলমানদের আগমনের পর বাস্তুপরিকল্পনায় বাড়ির বাইরে একটি চত্বর রাখতে দেখা যায়। চত্বরসংলগ্ন করে নির্মিত হতো বৈঠকখানা। বৈঠকখানা সাধারণত অতিথি অভ্যর্থনা ও সাময়িক অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে শ্রান্তি-বিনোদনের কাজেও বৈঠকের ব্যবহার শুরু হয়। মুসলমানদের অনুকরণে হিন্দুদের মধ্যেও বৈঠকখানার ব্যবহার হতে দেখা যায়। হিন্দুদের বৈঠকখানা হতো প্রায়শ পূর্বমুখী, কখনও বা দক্ষিণমুখী। কিন্তু মুসলমানদের বৈঠকখানা হতো পশ্চিমমুখী, কদাচিৎ দক্ষিণমুখী।[৬৪] ঘর ও বৈঠকখানার থাকত চওড়া বারান্দা। নগর ও গ্রামের অট্টালিকা ও সুলতানদের প্রাসাদে চওড়া বারান্দা দেখা যায়।

মুসলমানদের বাসগৃহসংলগ্ন মসজিদ থাকত।[৬৫] গ্রামীণ এলাকার মসজিদ তৈরির উপাদান কী ছিল– পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আমরা তার বিশেষ কিছু জানি না। তবে অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, বাসগৃহ, মাদ্রাসা, মণ্ডপ ও বৈঠকখানা নির্মাণে ব্যবহার্য উপাদান দিয়েই মসজিদ তৈরি হতো। শহর বা উল্লেখযোগ্য স্থানে চুন-সুরকির মসলা দিয়ে মসজিদ তৈরি হতো।[৬৬]

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সমকালীন বাংলার বাড়ি-ঘর সাধারণত উঁচু স্থানে নির্মিত হতো। ভিটা বা ভিটি উঁচু করার জন্য মাটি খননের ফলে পুকুর বা পরিখার সৃষ্টি হতো।[৬৭] পুকুরপাড়েই অনেকে বসবাস করত। পর্যটক আব্দুল লতিফের (১৭শ শতাব্দী) ডায়েরিতে তার উল্লেখ মেলে। তিনি লিখেছেন, 'পরগণা বাঘা গ্রামের মাঝখানে একটি সুন্দর পুকুর আছে। এর স্বচ্ছ পানি বেহেস্তের 'কাওসার'কে হার মানায়। তার চারপাশে দরবেশের সন্তান ও বংশধররা 'চকবন্দি' ঘর নির্মাণ করে বাস করে'।[৬৮] সেসময় ডোমেরা পুকুরপাড়ে বাস করত।[৬৯]

অভিজাত ও উচ্চবিত্তরাও পুকুরপাড়ে বাস করত। বিশেষত মুসলমান পরিবারগুলোর জন্য পুকুর অপরিহার্য ছিল।[৭০] মুসলমান মহিলারা পর্দা করতেন। ফলে স্নানের জন্য তাঁরা বাইরে নদীতে যেতে পারতেন না। পুকুরে স্নান করতেন। তাছাড়া ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কৃষিকার্জের সুবিধার্থে ও বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখাগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।[৭১] নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনেকে বাসগৃহের চারপাশে পরিখা খনন করতেন। নদীর ধারেও বাসগৃহ নির্মাণের চল ছিল।[৭২] বাড়ির সবাই স্নানসহ সমস্ত কাজ নদীতে সম্পন্ন করত।[৭৩] শুধু তাই-ই নয়, খাওয়ার পর পাশের খালে হাত পর্যন্ত ধুতে যেত।[৭৪]

আজকের মতো তখনও অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে সকলের বাড়ির চারদিকে বেড়ার ব্যবস্থা ছিল। একটি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, গৃহস্থের বাটিকা 'বৃত্তিবেষ্টিত' থাকত। বৃত্তি বেষ্টনের মাঝে মাঝে থাকত বৃত্তিবিবর (গবাক্ষজাতীয়

ছিদ্র)। এই বৃত্তিবিবর পথে অন্তঃপুরিকাগণ বাইরের দৃশ্য অবলোকন করতেন।[৭৫]

বিত্তবানদের বাড়ির বেড়া হতো ইটের তৈরি। সাধারণ মানুষেরা দিত নলখাগড়ার বেড়া। সরু নলের বেড়ারও প্রচলন ছিল। ছোট ছোট গাছের ঘন সারি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেড়ার কাজ করত। প্রতিটি বাড়ির আশে-পাশে খানিকটা করে জমি থাকত। অনেকে সেই জমিতে ফুল-ফলের বাগান করত। ইবনে বতুতা পনেরো দিন নৌপথে ভ্রমণকালে অনেক গ্রাম ও ফলের বাগান দেখেছিলেন।[৭৬] বাড়ির চারপাশের জমি জুড়ে থাকত কলা ও সুপারি গাছ।[৭৭] সেখানে আমরা দেখতে পাই, 'দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গুবাক সুন্দর'। সেকালে প্রচুর নারিকেল গাছ ছিল।[৭৮] হুগলী নদীতীরের একটি প্রাচীন গ্রামের ছবিতে নারকেল গাছ দৃষ্ট হয়। এঅঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। বাড়ির চারপাশের জমি জুড়ে বেড়ার মতো তালগাছের সারি থাকত।[৭৯] পোড়ামাটির ফলকে তাল, নারকেল, খেজুর, সুপারি গাছ দেখা যায়। নগরাঞ্চলে তাল ও নারকেল গাছ শোভা পেত।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, সুলতানি বাংলায় বাসগৃহ নির্মাণ ও পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। গৃহনির্মাণ উপকরণের সুলভতা ও রুচি বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করত। সুলতান বা শাসক ও অভিজাত তথা বিত্তবানরা তাদের নির্মাণকর্মকে স্থায়িত্বদানের জন্য নদীতীরে সুউচ্চ দৃষ্টিনন্দন ইটকাঠের ইমারত নির্মাণ করেছে। আবার বহু টাকা ব্যয়ে বাঁশ-খড় দিয়েও চৌচালা-আটচালা-বারোচালা ঘর তৈরি করে বাংলার ঐতিহ্যকে লালন করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসগৃহ নির্মাণে বিশেষ পরিকল্পনা কিংবা পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত না হলেও উপকরণগত মিল ছিল। বাঁশ ও খড়ই ছিল তাদের বাসগৃহ নির্মাণের প্রধান উপকরণ। পরিবেশের কোনো বালাই ছিল না। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, জাত-পাতের কারণে গ্রামের প্রান্তরে কিংবা টিলায় বিচ্ছিন্নভাবে বাসগৃহ নির্মাণ করা হতো। নৈসর্গিক কিংবা কোনো রমণীয় পরিবেশে তাদের বাসগৃহ নির্মাণের সুযোগ ছিল না। গৃহনির্মাণে অবস্থানিক ও পরিবেশগত দিক থেকে অভিজাত ও দরিদ্রদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। তবে উপকরণ ও শৈলীগত দিক থেকে তদানীন্তন বাংলার ঐতিহ্যকে সকলেই যুগপৎ লালন করেছে ও সমুন্নত রেখেছে।

টীকা ও তথ্যানির্দেশ

১. গুড়ি ভেলকো, ঢোলা ভেলকো, তরলী, মুলী, মুগর এবং বেউড়ি প্রভৃতি। দেখুন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৭০।

২. অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ. ৫৭।

৩. Adris Banerji, *The Temples of Tripura*, Quoted by Zulekha Haque, *Terracotta Decoration of Late Medieval Bengal*, Dhaka 1980, p. 81.

৪. কুমুদরঞ্জন দাস, 'সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ', *ইতিহাস অনুসন্ধান-৮*, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৩২।

৫. P. C. Baghchi, 'Political Relations between Bengal and China in the Pathan Period,' *Visva Bharati Annals, Vol. 1,* Calcutta 1945, p. 12.

৬. শিলালিপিটি আরবি কবিতায় লেখা। এটি বর্তমানে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে রক্ষিত। শিলালিপিটির শিলা ও লিপি দুই-ই অত্যন্ত সুন্দর। দেখুন, ড. মো. ওসমান গনী, *সুলতানী বাংলার প্রত্যাহিক জীবন*, অপ্রকাশিত পি-এইচ ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী, ২০০০, পৃ. ২১২।

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ১৪০-১৪১; 'নয় বৃহন্দ পরে হয়্যা গেলাম, রাজার দরবার'। দেখুন, কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃ. ২-৩।

৮. Joao de Barros, *Da Asia, Extracts in the Duarte Barbosa, Vol. II, Appendex-1*, pp. 239-248.

৯. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, কে. এম. আশরাফ, *হিন্দুস্থানের জন-জীবন ও জীবনচর্যা*, *তপতী সেন* গুপ্ত, অনূদিত, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ. ৩৭৩।

১০. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ২৯৩।

'অপূর্ব সুন্দর গৃহ করিল নির্মাণ
ফটিকের স্তম্ভ সব শোভে মনোহর।'

১১. ঐ, পৃ. ৩৫৬-৫৭।

১২. ঐ, 'হীরা ও ইয়াকুত পুরী নির্মায়, বিশাল'
'হীরা মনি-মনিক্য দেখি এ ঠামে ঠাম'

১৩. ঐ, পৃ. ৩০৩। 'সবে খণ্ড গৃহসপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর,
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্রবাট আছয়ে বিস্তর।'

১৪. P. C. Bagchi, *op. cit.*, pp. 121, 124; K K Mohammad, 'Hammams (Baths) in Medieval India, *Islamic Culture, Vol. LX11, No 4,* Hyderabad 1988 , pp. 37-56.

১৫. বংশীদাস রায়, *পদ্মপুরাণ*, শ্রীরামনাথ চক্রবতী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩১৮, পৃ. ৯৭।

১৬. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্য সপ্তশতীতে গৌড় বঙ্গ*, কলিকাতা ১৩৭৮, পৃ. ২৬৩।

১৭. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১০১,
'সুকুড় এসেরে কপাসু ফুটিলা,
ফিটেলি অন্ধারিরে আকাশ ফুটিলা।'

১৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, এসি সরকার সম্পাদিত, চুচুঁড়া ১৩৮৫, পৃ. ২০৪।
'অন্তপুরে সরোবর করিলা নির্মাণ'
পাষাণে রচিলা তার ঘাট চারখান।'

১৯. মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*, ময়মনসিংহ ১৯৪৫ পৃ. ১৭১, দীর্ঘ সরোবরে শোভে তারি চারিপাশ।'

২০. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ,২১৮। 'রচিলেন্ত এক টুঙ্গী অন্তঃপুর'; মযহারুল ইসলাম, *কবি হেয়াত মামুদ*, রাজশাহী ১৯৬১, পৃ. ১৬৩। 'লক্ষে লক্ষে দেখে টুঙ্গী, সুশোভিত নানারঙ্গি,
নির্মাইছে বিবিধ প্রকার'

২১. শাহ মোহাম্মদ সগীর, *ইউসুফ জোলেখা*, এনামুল হক সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য, ১০৬।

২২. ওয়াজেদ আহসান, 'আজব আজব ঘরবাড়ি', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২০ ভাদ্র ১৪০০, পৃ. ৬।

২৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ ৫৫৮।

২৪. Abul Fazl, *Ain-I-Akbar, Vol. 11*, Jarret & Sarkar, Calcutta 1948, p. 134.

২৫. মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়েবী*, ২য় খণ্ড, খালেক দাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ১২৮।

২৬. দীনেশ চন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৫৬০-৫৬১।

২৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, 'বাংলাদেশের লোক স্থাপত্য,' *বাএসোপ*, ৩য় খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৬।

২৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ৬ঘ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ. ৭৬

'মাছুয়া পক্ষীর পাখা দিয়া সাজুয়া বানায়'।

২৯. P. C. Bagchi, *op. cit.*, pp, 93-134.

৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭০, পৃ. ৩৫৬।

'চৌচালা ডেহেরি খান (ঘর) উডান ঘেষিয়া
ভিতরে আটচালা ঘর উলুখড়ের ছানি।'

৩১. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ২৪৪।

৩২. শাহনারা হোসেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা*, বৈশাখ ১৩৮০, পৃ. ৩৮।

৩৩. সৈয়দ আলী আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১। 'নগর বাহিরিয়ে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া,
চারি বাঁসে ভইলা রে দিআ চঞ্চালী।'

৩৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বাংলার পুরনারী*, কলিকাতা ১৩৩৯, পৃ. ৯৪।

৩৫. Abdul Latif's Accounts, A Description of North Bengal in 1609, tr. by JN Sarkar, *BPP, Vol. xxxv, Pt. 11 SL No. 69-70*, Calcuta 1928.

৩৬. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mughal Emperor (ed),* Delhi, 1978, p. 262.

৩৭. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*, নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯২১, পৃ.

'ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে তালপাতা ছাউনী,
ভেরেন্ডার খুঁটি তার আছে মধ্যখানি।'

৩৮. ওয়াজেদ আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৩৯. প্রেমময় দাস গুপ্ত, *ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত*, কলিকাতা তা.বি., পৃ. ৮০।

৪০. ঐ

৪১. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫।

৪২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)* কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ৪৬।

৪৩. রাজ শেখর বসু, *চলন্তিকা অভিধান*, কলিকাতা ১৩৮১, পৃ. ২৬৭।

৪৪. জুৎ >জুত > জুইত অর্থাৎ মনমত সুখ, সম্পূর্ণ বা সর্বাঙ্গীন স্বস্তি, যথাযথ, নিখুঁত-নিটোল আরামপ্রদ ঘর প্রসঙ্গে। দ্র. *ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৪৭৬।

৪৫. মো. আ. বাকী ও নাসরীন আহমদ, 'বাংলাদেশের প্রাচীন বসতির ধরন; একটি রূপরেখা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪১*, অক্টোবর ১৯৯১ পৃ.৮৪।

৪৬. কে এম আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৪৭. *ভারত চন্দ্র রায়, ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত কলিকাতা ১৩৬৯, পৃ. ১৬৩।

৪৮. কে এম আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

৪৯. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ*, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ১৯০।

৫০. MR Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, Dacca, 1965, pp. 330-31.

৫১. *Ibid.*

৫২. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৫৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ৬৯ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

৫৪. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্য সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, কলিকাতা ১৩৭৮, পৃ. ৭১।

৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, *৪র্থ খণ্ড*, কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ২৬৯।

৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ৩৫৬। 'চৌচালা ডোহরিখান (গৃহ) উডান ভরিয়া।'

৫৭. Ludivico de. Verthema, *The Travels of Varthema*, trans., John, Winter Jones, London, 1863, p. 155.

৫৮. সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা*, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৯৩।

৫৯. Quoted by M R Tarafder, *op. cit.*, p. 330.

৬০. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, সুকুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

৬১. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, প্রভাস চন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন।' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৭ খণ্ড, ৩ *সংখ্যা*, কলিকাতা ১৩২৭, পৃ. ১৯২.

৬২. *ঐ* ।

৬৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

৬৪. দুর্গাচন্দ্র স্যান্যাল (সম্পাদিত), *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩১৩, পৃ. ২২০।

৬৫. শাহ মোহম্মদ সগীর, *ইউসুফ জোলেখা*, এনামুল হক সম্পাদিত, 'প্রতি ঘর দ্বারে দ্বারে মসজিদ নির্মাণ।' ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১২০।

৬৬. কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, 'সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ', *ইঅ-৮*, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৩২।

৬৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭০, পৃ. ৩৮০। 'কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুস্কুর্নি কাটায়'।

৬৮. Abdul Latif's Accounts, *op, cit.*, pp 143-144.

৬৯. উদ্ধৃতি সংগৃহীত, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জন-জীবন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

৭০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।
'বড় পুকুর সামনে যার দশহাত পানি।'

৭১. শরীফ উদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত, *দিনাজপুর: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৬।

৭২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫। 'ভাল কইরা বান্ধে বাড়ি সুত্যা নদীর কানে।' *ঐ* ২য় খণ্ড, পৃ.৩৪০। 'গাঙের কুল্যা বাড়ি।'; ঐ, ৬৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯। 'বাড়ির কাছে গাঙের ঘাট সকাল সন্ধ্যা বেলা'।

৭৩. *ঐ*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪, ২৬৫। 'তেল মাইখ্যা বাসু নাই ছান করবার গেল।'
'দেবর-ভাসুর তামাক খ্যায়া করবার গেল ছান।'

৭৪. *ঐ*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯। 'চারজনে উইঠা গেল মুখ ধুইবার খালে।'

৭৫. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

৭৬. Ibn Batutah's Account of Bengal, *op. cit.,* pp.12-13.

৭৭. মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, ময়মনসিংহ, ১৯৪৫, পৃ. ৭৮।

৭৮. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ. ৭০।

৭৯. সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব*, কলিকাতা ১৯৬০, পৃ. ২৮।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন

প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী*

সার সংক্ষেপ: *ক্ষণবাদী দর্শনে বিশ্বাসী দার্শনিক ওমর খৈয়াম মানবজীবনের সুখ-দুঃখে বিচলিত ছিলেন না। নিরহংকার ও মোহমুক্ত ওমর অযথা হা-হুতাশ না করে জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য রুবাইয়ের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। সেই আলোকে এই প্রবন্ধে জীবনদর্শনে কবি ওমরের যে মত ও পথ–তার রূপরেখা চিত্রিত হয়েছে।*

প্রায় ছয়শত রুবাইয়াতের রচয়িতা পারস্যের মহাকবি হিসেবে পরিচিত গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম।[১] পারস্য সাহিত্যের একাদশ শতকের এই মহান জ্যোতির্বিদ কবি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একদিকে মহাশূন্যের অসীম রাজ্য, অপরদিকে মানবের বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনার জীবন্ত বিষয়। ওমর একাধারে ছিলেন জ্যোতির্বিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কবি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ওমরের পদবি ছিল 'খৈয়াম'। 'খৈয়াম' অর্থ তাঁবু মেরামতকারী কিন্তু কবি তাঁর নিজ পেশা সম্পর্কে এক চতুষ্পদীতে বলেছেন:

খৈয়াম বটে দিবারাত্র দর্শন-তাঁবু করত সেলাই,
পড়ে গিয়ে শোকের চুলায় জ্বলে পুড়ে হয়েছে ছাই।
কেটে দেছে যমের কাঁচি জীবনের তার রশি সকল,
আশা দালাল বেঁচে তারে মূল্য কিছুই লাভ করে নাই।[২]

এই রুবাই থেকে স্পষ্ট যে, ওমরের 'খৈয়াম'[৩] পদবি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁবু মেরামত করেননি; তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি মেরামত করেছেন, এ সবের যে অংশ ছেঁড়া-ফাটা ছিল তা সেলাই করেছেন মাত্র। কিন্তু মৃত্যু-যম তার কাঁচি দিয়ে সেলাই সুতা সবকিছু কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে, অবশেষে প্রকৃত মূল্য হতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি বঞ্চিত হন। অন্য এক রুবাই-এ কবি বলেছেন:

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের সূত্র রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।[৪]

এই রুবাই হতে জানা যায় যে কবি একজন বড় দার্শনিক, তিনি গভীর তত্ত্বসমূহ ঘাঁটাঘাটি করে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্র ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞানেরও বিষয়। বহু বিষয়ের ওপর ওমর খৈয়াম চমৎকার আঙ্গিকে তাঁর রুবাইয়াত রচনা করেছেন। তাঁর রুবাইয়াতের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো

*ডিন, লিবারেল আর্টস অ্যান্ড হিউম্যান সায়েন্স অনুষদ, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, খুলনা।

জীবনদর্শন–যা তিনি নিজস্ব পরিকল্পিত চিন্তাধারা অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলেছেন। সংশয়বাদী কবি মাঝে মধ্যে আশা ও নিরাশার মধ্যে আবার ঘুরপাকও খেয়েছেন। ফলে তাঁর মধ্যে এক দ্বৈতসত্তা কাজ করেছে।

মহান আল্লায় বিশ্বাসী কবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবের কষ্টের জন্যে আল্লাহর ওপর দোষও চাপিয়েছেন। সেখানে তিনি ভাগ্যের কথা বলে মানুষের দোষকে এড়িয়ে গেছেন। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তিনি হতাশ হয়েছেন, আবার আশাও ছাড়েননি। কবির এহেন দোদুল্যমানতা তাঁকে পৃথিবীর এক বিশেষ স্থানে দাঁড় করিয়েছে। সেখান থেকে জীবনকে কীভাবে গড়তে হবে, তা তিনি পরখ করেছেন। আর জীবনকে ওমর মূল্যহীন ও অকার্যকর বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনেক সংশয়, নিরাশা, দুঃখ ও বেদনা তাঁর মনকে পীড়িত করলেও এ সবের ভিতর দিয়ে কবি এক দৃঢ় শক্তিশালী অথচ আবেগময় জীবনের সন্ধান করেছেন। জীবন সাধারণত ভালো-মন্দের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। মন্দের ভাগ বেশি হলেও ওমর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কীভাবে মানবজীবন পরিচালিত হতে পারে, তার স্পষ্ট রূপরেখা এঁকেছেন।

বস্তুত জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে এগিয়ে নেয়ার ও গঠন করার অনেক প্রস্তাব তাঁর রুবাইয়াতের ভাষায় ও ছন্দে উপস্থাপিত। ওমরের এই জীবনদর্শন কতকগুলো বাস্তব পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, তিনি সময়কে অপচয় না করে একে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর উপদেশ দিয়েছেন এভাবে:

জানি স্বাধীন ইচ্ছামত যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।[৫]

ওমর খৈয়াম অত্যন্ত সংবেদনশীল এক প্রেমিক-কবি। তিনি জীবনের জন্য বিশেষ কিছু মহার্ঘ্য বা আয়েশ দাবি করেননি। বরং অত্যন্ত সামান্য কিছু নিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে অবলোকন করেছেন এবং সেটাই বোধ হয় তাঁর কাম্যও ছিল:

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিলকে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইবো নাকো তখৎ আমি শাহানশার।[৬]

উপরের রুবাইটির মর্মার্থের জন্যে ওমরকে ভোগ-সুখবাদ প্রচারের দোষে দোষী করা হয়। কিন্তু It (Epicurean philosophy) also expresses his revolt against the hypocrisy and fanaticism of the dogmatic priesthood.[৭]

বলা হয়ে থাকে, সকল মহৎ কবিই স্বভুবনে এক ধরনের রাজার রাজা। রাজারা রাজত্ব করেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু কবিরা রাজত্ব করেন যুগ-যুগান্তর। একজন

শাহানশার অনেক বিষয়-সম্পদ কিন্তু কবি ওমর তাঁর জীবনের জন্য দাবি করেছেন শুধু একটু রুটি, প্রিয়া, একখানি কবিতার বই ও এক সোরাহি সুরা এবং এ সবই কবির নিকট একজন বাদশার শান-ঐশ্বর্যের সমতুল্য। বস্তুত এই প্রত্যয়ের মধ্যে তিনি স্বর্গসুখ অন্বেষণ করেছেন। যদিও এ ধরনের রুবাই জীবনের অলসতাকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সমর্থন করে, তবু– Idleness did not, however, draw him into laziness or fashionable debauch, or on to the Turf. He chose for his favourite motto: "Plain living and high thinking".[৮] এ থেকে বোঝা যায়, খৈয়াম মোটেই মনে-প্রাণে অলসতা সমর্থন করেননি। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ এবং তা ছিল সাধারণভাবে জীবনযাপন করা এবং উচ্চমানের চিন্তা-ভাবনা পোষণ ও লালন করা। বিশ্বের অনেক বিখ্যাত দার্শনিকের জীবন, যেমন সক্রেটিসের জীবন এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে।

সৌন্দর্যপ্রিয় কবি ওমর জীবনকে অত্যন্ত সাধারণভাবে, সততার সঙ্গে ও বিনয়ভরা হৃদয়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন। গর্ব, অহংকার, কপটতা, ভণ্ডামিকে তিনি কঠিনভাবে ঘৃণার চোখে দেখেছেন এবং অপূর্ব ভাষার ব্যঞ্জনায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন:

ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়-লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ![৯]

কবি ওমর জীবনকে এ ধরনের ভণ্ডামির কলুষতা হতে মুক্ত করে জ্ঞানীর হাতে ন্যস্ত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই জ্ঞানী যেন অর্বাচীন, অহংকারী ও অযোগ্য না হয়, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধিতে তিনি যেন পাকাপোক্ত হন। কী অপূর্ব তাঁর সেই প্রত্যাশা!

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি করবে তাহা বিসর্জন![১০]

অজ্ঞ, আনাড়ি, অমার্জিত, অভদ্র ব্যক্তি হতে কবি সবসময় জীবনকে দূরে রাখার জন্য রুবাইয়াতের মধ্য দিয়ে আকুতি জানিয়েছেন। এই রুবাই-এর মধ্যে একটি 'বিরোধাভাস'-এর মাধ্যমে তিনি জ্ঞানী ও আনাড়ির পার্থক্যগত পরিছন্ন একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নির্বোধ ও অর্বাচীন ব্যক্তি জীবনকে কোনো সাহায্য করতে পারে না, তাদের কোনো মহত্ত্বের উপলব্ধি নেই, সত্যের আলোর প্রতি তারা সর্বদা অন্ধ। তাই তারা অমৃত দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য কবি উপদেশ দেন, কারণ

প্রকৃতপক্ষে তারা অমৃত চিনে না। কবির মতে জীবনের প্রত্যয়কে শক্তিশালী করার জন্য, হৃদয়কে আলোকিত করা শুধু একজন জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়, বরং ঐ জ্ঞানীরও যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ তার মধ্যে গভীর জীবনবোধ ও সত্য উপলব্ধির পরিপূর্ণতা থাকতে হবে। অন্তরহীন ও অমার্জিত ব্যক্তি তাই কবির কাছে বাতিলযোগ্য:

বন্ধু বেছে নিস্‌নে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।[১১]

দার্শনিক ওমর জীবনকে এদিক থেকে পরিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে চেয়েছেন। মনোরম চাকচিক্যময় দুনিয়ার কোনো কিছুর আকর্ষণ হতে তিনি জীবনকে দূরে অবলোকন করেছেন, জীবনের নির্ভীক মর্যাদার প্রতি কবি নিতান্ত সজাগ। কবির নিকট এ জীবন প্রকৃতই দামী, সুন্দর ও আত্মমর্যাদাবোধের অধীন। কোনো কিছুর জন্যে জীবনকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা ভরে দেখা কবির পক্ষে হীনমন্যতার শামিল। জীবনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে তিনি মুক্ত রাখার জন্য মিনতি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠতে হবে এবং বন্যার মতো প্রাণকে ভাসিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া জীবনের গভীরতা ও স্থায়িত্ববোধ সম্পর্কে কবি সচেতন। মানুষকে পথের ধুলো হতে তিনি নিষেধ করেছেন, কারণ তা হলে সবাই এই সুন্দর মূল্যবান জীবনকে অনায়াসে পায়ে মাড়িয়ে যাবে:

দাস হয়ো না মাৎসর্যের, হয়ো নাকো অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর না করে ঠুনকো যশো-খ্যাতির সখ,
অগ্নিসম প্রদীপ্ত হও, বন্যাসম প্রাণোদ্বেল,
হয়ো নাকো পথের ধুলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক।[১২]

কবি ওমর মানবপ্রবৃত্তির সহজাত ধর্মকে নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। প্রবৃত্তির সহজাত গুণগুলোকে বরং লালন করলে মানবজীবন সকল বাধা-বিপদ ও অসহায় অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হয়ে এক প্রেমময় ও জ্ঞানময় পরিবেশে বিরাজ করতে থাকবে। দুঃখ জীবনের সাথী, তা জীবনের সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, দুঃখ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। প্রসঙ্গত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের মতে দুঃখ মানুষকে জ্ঞানী বানায়। এই দুঃখকে কবি ওমর দূর করার সহজ উপায় দেখিয়েছেন:

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ শোকের এই দাওয়াই,
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই।
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে এই যে ভাই।[১৩]

এই রুবাইয়ের শেষের দুই লাইনে কবি ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায় উৎঘাটন করে দিয়েছেন। ওমর ঠিকই বলেছেন, অভাবের কারণে কখনও যেন স্বভাব নষ্ট না হয় অর্থাৎ অভাবে স্বভাব নষ্ট না করলে কারুর অভাব হওয়ার কথা নয়। অভাব ছিল, আছে ও থাকবে, সুতরাং অভাবে মানবপ্রবৃত্তির সততা ও স্বচ্ছতা নষ্ট করলে মানবজীবন গঠনের জন্য যে ছয়টি গুণ অপরিহার্য, তা লাভ করা সম্ভব হবে না। মানবজীবন প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য– এই ছয়টি সম্পদ অলংকৃত করে থাকে। মর্যাদাশীল জীবনের জন্য মহামূল্যবান এই গুণ বা সম্পদগুলো আয়ত্ত করতে হলে কবির মতে, ধৈর্য, শিষ্টতা, সৎস্বভাব ইত্যাদির যথার্থ লালন প্রয়োজন। তাই জীবন গঠনের জন্য দার্শনিক ওমর অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

ওমর খৈয়াম অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও দৃঢ় চরিত্রের এক উন্নত মহান পুরুষ ছিলেন। নিজ স্বকীয়তাকে কোনোদিন তিনি জলাঞ্জলি দিতে রাজি নন। পৃথিবীতে তথা সমাজে অন্যের মতো তিনিও একজন মানুষ, তবে তিনি যারপরনাই দৃঢ়চেতা-ভাগ্যকে মেনে নেয়ার জন্যে সবসময় প্রস্তুত:

অঙ্গে রক্ত মাংসের এই পোষাক আছে যতক্ষণ-
তকদীরের ঐ সীমার বাইরে করিসনে তুই পদার্পণ।
নোয়াসনে শির, 'রুস্তম' 'জাল' শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত যদি হয় 'হাতেম-তাই' তাহারও দান নিসনে, শোন![১৪]

খৈয়াম মানবজীবনের সৃষ্টি কৌশল নিয়েও রুবাইয়াত রচনা করেছেন। এ ধরনের একটি রুবাই-এর অনুবাদ নীচে তুলে ধরা হলো। এর অনুবাদক নুরুন নাহার বেগম, যিনি মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ করেছেন:

কিবা অপরূপ মুখখানি মোর বসন্তফুল সম,
কিবা দেহখানি তরুসম যেন অপূর্ব মনোরম।
জানি না কেন বা অজানা কোন সে শিল্পী চিরন্তনী,
সৃজিল আমাকে কোন প্রয়োজনে আনন্দগৃহে মম।।[১৫]

অনুবাদক তাঁর পুস্তকে আবার গদ্য অনুবাদও দিয়েছে, যা নিম্নরূপ:

'কি অপরূপ সুন্দর আননখানি আমার টিউলিপ ফুলের মত। কি অনুপম দেহখানি আমার ঝাউবৃক্ষের মত। আমি জানিনা কোন সে অজানা শিল্পী কি প্রয়োজনে আমাকে এই আনন্দগৃহে সৃষ্টি করলেন।' এই রুবাইটিতে ওমর মানবের চেহারা ও দেহ– উভয়ই সুন্দর ও মনোরম বলেছেন। পাক কোরানে সুরা 'আত ত্বীন' এ উল্লেখ আছে:

'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানে তাকউইম', অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করেছি। রুবাই-এ 'শিল্পী চিরন্তনী' বলতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বুঝিয়েছেন।

ভারতের পশ্চিম বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছেন। তিনি পুস্তকের ভূমিকায় বলেন, 'একবার কোন একটা কাজে আমায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থপঞ্জী ঘাঁটতে হয়। তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম, বাংলা ভাষায় আবহমান কাল ধরে ওমরের কবিতা অনূদিত হয়ে আসছে। কম করেও পঞ্চাশ জন তাঁর কবিতা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন।.....সেই থেকে, স্বপ্নের মধ্যে, ওঁদের সকলের গোত্রভুক্ত হবার বাসনা পুষে আসছিলাম। আজ সেই বাসনা পূরণ হলো'।[১৬]

খৈয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– নিয়তি; বলাবাহুল্য যা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবন, গৌরব, বীরত্ব, পৃথিবী– সবই ক্ষণস্থায়ী:

গল্প কথায় অল্পে বলে : সিংহ এবং সরীসৃপে
জাম্‌শিদের গৌরবে থাকে একত্র ও রাজসমীপে
শিকারীদের সবার শ্রেয়, বাহ্‌রামকে, বন্য গাধায়
বধ করেছে, ঘুমান তিনি, আমরা দেখি দৈব ধাঁধা।।[১৭]

উপরের রুবাইটিতে জাম্‌শিদ বাদশা ও পৃথিবীর এক কালের শ্রেষ্ঠশিকারী বাহ্‌রামের নিয়তির কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। জাম্‌শিদ বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার রাজকীয় জৌলুস, আমোদ-প্রমোদ সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তদরূপ রাজশিকারী বাহ্‌রাম যে সারাজনম বাঘ-সিংহ শিকার করেছেন, আজ তিনি মৃত্যুর শিকার হয়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেছেন।

ভারতের লক্ষ্ণৌ-এর বাসিন্দা জাস্টিস রায় বাহাদুর অপ্রকাশ চন্দ্র বোস ফার্সি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন বড় প্রেমিক ছিলেন। তিনি মূল ফার্সি হতে ওমরের ৭৭৩টি রুবাই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তাঁর অনূদিত নীচের রুবাইটি খুব চমৎকার:

In thy love, reproach is not shameful, in this regard there is no quarrel with those who are ignorant (of my love): the sweet sherbat of love is for all heroes and it is not for the pusillanimous to enjoy its luxurious sweetness.[১৮]

এই রুবাইটিতে কবি বলেন, ঐশী প্রেমে তিরস্কৃত হওয়া কোনো লজ্জাকর বিষয় নয়। আমার এই প্রেম-ভালোবাসার বিষয়ে যারা অজ্ঞ তারাই শুধু বিবাদ বাঁধায়। কেবল

বীরদের জন্য প্রেমের শরাব উপযোগী, ভীরু কাপুরুষরা এর পর্যাপ্ত মিষ্টতা উপভোগ করতে অক্ষম। কাজেই জীবনের জন্য ঐশী প্রেম প্রয়োজন তা কবি অনুধাবন করেন।

দার্শনিক খৈয়ামের জীবনদর্শন একটি মহিমান্বিত উজ্জ্বল জীবনকেই নির্দেশ করে। মানুষ হয়ে মানুষের নিকট মাথা নত করতে তিনি নিষেধ করেছেন; এমনকি যদি মহাবীর রুস্তম-এর মতো ব্যক্তি তার শত্রুও হয়। অপরদিকে বিশ্ববিখ্যাত মহানদাতা হাতেম-তাইও যদি বন্ধু হয় তবু তাঁর নিকট হতেও দান হিসেবে কপর্দক গ্রহণ করতে তিনি রাজি নন। এ সত্যিই এক মহৎ জীবনের অঙ্গীকার, যা কাব্যের ভাষাতে অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হয়েছে। কবি তকদির বা ভাগ্যলিখন মেনে নিয়ে জীবনের সত্যকে আঁকড়ে ধরতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ সত্যের উপরে কোনো কিছু মহান-এর অস্তিত্ব-এ চিন্তা করা ব্যর্থতারই নামান্তর। সবকিছুই অনস্তিত্বে বিলীন হবে, তখনও সত্য থেকে যাবে। তাই দার্শনিক খৈয়াম গেয়েছেন:

খামকা ব্যথার বিষ খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেববাজির এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়,
আখেরে ত দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন-ভয় ভাবনা যাক চুলায়![১৯]

পৃথিবী এখন শেষ জামানায় বিরাজ করছে। এর পরেই তো কেয়ামত। এখান থেকে এক হাজার বছর আগে দার্শনিক ওমর সমাজ ও জামানার অবস্থা এই রুবাইয়ে তুলে ধরেছেন। সেই হাজার বছর আগের জামানা অবিশ্বাস, বঞ্চনা, প্রতারণায় ছিল পরিপূর্ণ, ঠগ, দাগাবাজ ব্যক্তিরা সমাজে অন্যায় করতে দ্বিধা করত না। তাই ওমর মানুষকে হতাশা, ভয়, দুঃখ, বেদনায় ভেঙ্গে না পড়ে সত্য-ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে জীবনকে এগিয়ে নেয়ার উপদেশ দিয়েছেন। জগৎ নানা অমূল্য সুন্দর মনোরম জিনিসের কেন্দ্রস্থল। এসব বস্তু দেখতে কত চমৎকার, কত মনোহর! কিন্তু দার্শনিক খৈয়ামের মতে প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট এ সব কিছুই মূল্যহীন। কবি জীবনকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ দেন। তাই দেখা, শুনা ও কথা বলা হতে বিরত থাকা সম্পর্কে ওমর বলেন:

জগৎ মাঝে জীবন- পথে সতর্কতা চলা উচিত,
জগতের সব কাজে কথায় মুখটি বুঁজে থাকা বিহিত।
যাবত তোমার চক্ষু কর্ণ জিহ্বা দেহে থাকে বজায়,
পৃথিবীতে থাকবে যেন চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা রহিত।[২০]

জীবনের গোপন রহস্য অযোগ্য, মূর্খ, অর্বাচীনদের নিকট প্রকাশ করার জন্য কবি নিষেধ করেছেন, কারণ এই সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞানের সারবস্তু বুঝতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সুতরাং তাদের নিকট উচ্চ জ্ঞানমার্গের তথ্য বা তত্ত্বকথা প্রকাশ করলে তারা প্রকৃত

অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবে এবং এর ফলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ওমর বলেছেন:

অযোগ্যের ঠাঁই রেখো গোপন রহস্যটি সাবধানে,
ফাঁস করো না ভেদের কথা কভু মূর্খদেরি স্থানে।[২১]

খৈয়াম মানুষকে সবসময় খুশী রাখার জন্য তার জীবনদর্শনের অংশ হিসেবে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনে আনন্দ ও শান্তি সৃষ্টির উপায় ও পদ্ধতি চতুষ্পদীর মধ্যে অবিচলভাবে ব্যক্ত করেছেন:

এন্তার সব শ্রদ্ধা পাঁবে বড় ছোট সকলকার,
মুসলিম খ্রীষ্টান ইহুদী সবার যশো গাঁথা গাও।[২২]

দার্শনিক ওমর জীবনের কোনটি উত্তম কাজ, কোন কাজের দ্বারা হৃদয়ে হৃদয়ে সংহতি বজায় থাকবে এবং কোন কাজের দ্বারা তাঁর মতে পুণ্য অর্জন করা সম্ভব, তা নিম্নোক্ত রুবাই-এ অপূর্ব ভাষার লালিত্যে প্রকাশ করেছেন:

মরুর বুকে বসাও মেলা উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের!
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ-
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।[২৩]

একটি মানব হৃদয়কে খুশী রাখা ও ভালোবাসা কবির নিকট এমন একটি মহৎ কাজ, যার তুলনা জগতে বিরল। মরুভূমির বুকে জমজমাট উপনিবেশ স্থাপন, এমনকি হাজার কয়েদি মুক্ত করার চেয়েও একটি হৃদয়কে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা ও খুশী করা উজ্জ্বল জীবনের একটি মহত্তম উপায় এবং এখানেই মানব হৃদয়ের সার্থকতা।

দার্শনিক ওমর প্রবলভাবে মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রের প্রতি সবসময় লক্ষ রাখার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তারা যেন তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত না হয়, কারো মনে-প্রাণে ব্যথা না দেওয়ার জন্য এবং ক্ষতি না করার জন্য ওমর মিনতি জানিয়েছেন এভাবে:

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
কারুর প্রাণে দাওনা ব্যথা মন্দ কারুর নাহি চাও,
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে নাইবা চললে তায় বা কি!
আমি তোমায় স্বর্গ দিব, আপাতত শরাব নাও।[২৪]

দার্শনিক ওমর খৈয়াম বর্তমানকে নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর মতে অতীত ও

ভবিষ্যৎ মূল্যহীন, যা চলে গেছে এবং যা এখনও আসেনি–এ সবের ওপর আস্থা রাখা তাঁর মতে জীবনের জন্য অর্থহীন:

> Ah, take the Cash, and let the Credit go
> Nor heed the rumble of a distant Drum.[২৫]

এভাবে ওমর আখেরি অর্থাৎ শেষ জামানার জীবনকে সুন্দররূপে অল্প তুষ্টি নিয়ে উপভোগ করার জন্য অনেক চতুষ্পদীতে উপদেশ, অনুরোধ ও মিনতি জানান। ওমরের নিকট জীবন ও জগৎ অর্থহীন ও মূল্যহীন, কারণ একদিন সবই অনস্তিত্বে বিলীন হবে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে অল্পে খুশী থেকে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

এটাই দার্শনিক খৈয়ামের জীবনদর্শনের সারকথা।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১. মোবাশ্বের আলী, বিশ্বসাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ২০৪।

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ২১।

৩. টিকা, 'খৈয়াম' অর্থ তাঁবু মেরামতকারী।

৪. কান্তি ঘোষ (অনু), সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম' শীর্ষক ভূমিকা হতে গৃহীত, রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, মোহন লাইব্রেরী কলিকাতা-৯, ১৯৬৫।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, মোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯, ১৯৬৫, ৩০-সংখ্যক রুবাই।

৬. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত ৬১-সংখ্যক রুবাই।

৭. Najib Ullah, Islamic Literature, Washington Square Press, Inc. New York, 1963, p. 265.

৮. Robert Graves and Omar Ali Shah, Rubaiyyat of Omar Khayaam, Penguin Books, Great Britain, 1972, p. 18.

৯. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত, ১৩৫-সংখ্যক রুবাই।

১০. প্রাগুক্ত, ১৪৪-সংখ্যক রুবাই।

১১. প্রাগুক্ত, ১৪২-সংখ্যক রুবাই

১২. প্রাগুক্ত, ১৪৩-সংখ্যক রুবাই।

১৩. প্রাগুক্ত, ১৪৬-সংখ্যক রুবাই।

১৪. প্রাগুক্ত, ১৫৫-সংখ্যক রুবাই।

১৫. নুরুন নাহার বেগম (অনু), রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম, লেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, প্রাগুক্ত, ১-সংখ্যক রুবাই।

১৬. শক্তি চট্টোপাধ্যায় (অনু), ওমর খৈয়ামের রুবাই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৮।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১।

১৮. A. C. Bose, Rubaiyyat-i-Omar Khayaam, Modern Book Depot, 78 Chowringhee Centre, Calcutta-13. Rubai No.155.

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত, ১৮১-সংখ্যক রুবাই।

২০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, পৃষ্ঠা ২২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, ১৮৭-সংখ্যক রুবাই।

২৩. প্রাগুক্ত, ৬৮-সংখ্যক রুবাই।

২৪. প্রাগুক্ত, ১৪০-সংখ্যক রুবাই।

২৫. Edward Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam, Macmillan, 1967, p. 31.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

ঘুষের লেনদেন : ভঙ্গিমা ও পরিভাষা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার*

ভূমিকা

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করিয়ে নেবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে যে অবৈধ অর্থ বা অন্য কোনো রকম আনুকূল্য প্রদান করা হয়, তাকে সাধারণভাবে 'ঘুষ' বলা হয়। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকে গণতান্ত্রিক সমাজে আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাপী ঘুষের ব্যবহার ও চর্চাকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সত্তরের দশক থেকে দুর্নীতি-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে কাজ শুরু করেন। এ সময় থেকে দুর্নীতির বিভিন্ন শাখায় বর্ধিত আকারে গবেষণার কাজ শুরু হয়।[১] সত্তরের দশকে আমেরিকায় ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দুর্নীতিকে তাঁদের আগ্রহের গবেষণা-এলাকা হিসেবে গ্রহণ করেন। এসব দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণা কাজে ঘুষের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। কিন্তু তখন থেকেই ঘুষের ওপর পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা কাজ করা হয়নি। তবে পরবর্তীকালে ঘুষের ব্যবহার, পরিধি ও চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ গবেষকগণ ঘুষের ওপর পৃথকভাবে কাজ শুরু করেন। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে সুশাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পাশ্চাত্যে ঘুষের ওপর পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।[২] এসব গবেষণা কাজে ঘুষের ক্ষতি, কারণ, প্রতিকারের জন্য পরামর্শ এবং ঘুষ গ্রহণের ভঙ্গিমার ওপর যতটা আলোকপাত করা হয়েছে, ঘুষের প্রায়োগিক চর্চা, লেনদেনের ভঙ্গিমা ও পরিভাষার ওপর ততটা আলোকপাত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে যেসব সমাজবিজ্ঞানী কাজ করেছেন তাদের একটি সীমাবদ্ধতা হলো, তাদের প্রকাশিত কাজগুলো রাজনীতিক ও প্রশাসনিক এলাকার ঘুষচর্চার বিষয়গুলো উপস্থাপন করলেও সামাজিক ঘুষের ওপর অত্যন্ত অপ্রতুল আলোকপাত করেছে। ফলত এ বিষয়টির ওপর এ নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে। সেইসঙ্গে এ নিবন্ধে ঘুষের চর্চা, লেনদেনের ভঙ্গিমা ও পরিভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাও করা হবে। তবে এ আলোচনা করতে গিয়ে ঘুষের পটভূমি, ঘুষ বৃদ্ধির কারণ, ঘুষ নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রভৃতি বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এ নিবন্ধ রচনায় মূলত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা।

পটভূমি

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানবসমাজে ভালর সঙ্গে মন্দ, নীতির সঙ্গে দুর্নীতি এবং নিয়মের সঙ্গে অনিয়মের উপস্থিতি বিরাজমান ছিল। দুর্নীতির চর্চা ও সক্রিয়তা মানবসমাজে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিদ্যমান ছিল। তবে আদিম সমাজে বা মধ্যযুগে দুর্নীতি এবং ঘুষের মাত্রা, পরিধি ও চর্চা বর্তমানকালের মতো ছিল না। তখন ঘুষ সমাজে ভিন্ন আকারে সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে একদিকে জনসংখ্যা ও অন্যদিকে নাগরিকদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব কাজ সুসম্পন্ন করতে সরকারের কর্মচারীদের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হয়। ফলে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হয়। এ ক্ষমতা ব্যবহারের সঙ্গে স্বীয় স্বার্থে অনেক কর্মকর্তা এর অপব্যবহারও শুরু করেন। এভাবে সরকারি প্রশাসনে ঘুষের ব্যবহার শুরু হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে সমাজের অন্যান্য এলাকায় সংক্রামিত হয়। তবে প্রথম দিকে দুর্নীতি এবং ঘুষের ব্যবহার সীমিতপর্যায়ে থাকায় একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এর তেমন প্রাদুর্ভাব হয়নি। কিন্তু বিগত তিনদশক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি ও ঘুষের ব্যবহার এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা এখন এটিকে সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন।

অনেক স্বল্পোন্নত দেশে দুর্নীতি এবং এর অন্যতম মাধ্যম ঘুষকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, উন্নত দেশগুলোতে ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা মোটেই নেই। সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশগুলোতেও ঘুষের চর্চা সুশাসনের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে উন্নত দেশগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মতো ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা সর্বত্র মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েনি; যেভাবে আফ্রিকার এবং দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে ঘুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিত্য সঙ্গীর মতো রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজের সকল শিরা-উপশিরায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশে অফিস-আদালত, প্রশাসন, বিচারালয় থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বত্রই ঘুষের চর্চা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা অনুদান নিতে হলে শিক্ষাভবনে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।[৩]

আরেকজন বাংলাদেশী অ্যাকাডেমিশিয়ান দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে ভয়ানক অপরাধ করেও তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশকে ঘুষ দিয়ে অপরাধীরা কীভাবে স্বচ্ছন্দ্যে সমাজে চলাফেরা করে।[৪] বস্তুত এসব দেশে ঘুষ আর শুধু কাস্টমস, পুলিশ, ফরেস্ট, ট্যাক্স প্রভৃতি ঘুষ চর্চার জন্য এযাবৎ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে পরিচিতি পাওয়া

বিভাগগুলোর মধ্যে সীমিত নেই, পরিবর্তে এই সামাজিক ব্যাধিটি এখন যুগপৎ সমাজে তথা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি অফিস-আদালতে, ধর্মীয় এবং এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া এসব দেশে রাজনীতিতেও ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিয়োগ, দলীয় পদ-পদবি পেতে ঘুষের আশ্রয় নেবার অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণ গরিব ভোটারদের সমর্থন ক্রয়ে বিভিন্ন কৌশলে তাদেরকে ঘুষ দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের সমর্থক নেতা-কর্মীদেরকে ভোটারদেরকে ফ্রি চা-পান-বিড়ি-সিগারেট থেকে শুরু করে শাড়ি, লুঙ্গি, জামা, চাদর এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে নগদ অর্থ ঘুষ হিসেবে প্রদান করে তাদের ভোট ক্রয়ে সচেষ্ট থাকতে দেখা যায়।

একজন বাংলাদেশী নির্বাচন গবেষক তাঁর প্রকাশিত একটি গবেষণা কর্মে ১৯৮০-র দশকের একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার চরকুলিয়া ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর কেবলমাত্র নির্বানের দিন ভোটারদের সমর্থন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আনুকূল্য পেতে তাদেরকে ঘুষ প্রদানের লক্ষ্যে ভোটের আগের দিন ১,৬০০ প্যাকেট বিড়ি, ৫০ প্যাকেট স্টার এবং ২৫ প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট, ৯,৬০০ পাতা পান, ৩,৪৬৫টি সুপারি, দুই সের তামাক, ১৬ পাউন্ড চা পাতা এবং ১০ কেজি চিনি ক্রয় করার তথ্য উপস্থাপন করেন।[৫]

ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা সুশাসনের জন্য অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় একে বিশ্বব্যাপী একটি বড় রকমের সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এ কারণে এখন বিভিন্ন দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন আইন ও বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বজনীন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণেই এখন দেশে দেশে সূচকের মাধ্যমে দুর্নীতি পরিমাপের মতো একই ভঙ্গিমায় ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ঘুষের সূচক (ব্রাইবারি ইনডেক্স) প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সরকার এই সূচক দেখে ঘুষচর্চার ক্ষেত্রে নিজ দেশের অবস্থান অনুধাবন করে। এবং এ ক্ষেত্রে নিজ দেশের অবস্থান খারাপ অর্থাৎ নেতিবাচক হলে নতুন নতুন আইন বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে ঘুষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হচ্ছে। এ উপমহাদেশে ষাট বা সত্তরের দশকেও ঘুষের চর্চা সীমিত আকারে কয়েকটি সরকারি বিভাগে সীমিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলোতে ঘুষের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্প্রতি সমাজের সকলস্তরে এ সামাজিক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ঘুষের চর্চায় জড়িত হয়ে

পড়েন। বর্তমানে এ দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা এতই ব্যাপকতা পেয়েছে যে অনেকক্ষেত্রে স্কুলে ছাত্র ভর্তি করাতে গেলে, বা একটি রেলওয়ের টিকেট কিনতে গেলেও ঘুষের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ঘুষ বৃদ্ধির কারণ

সঙ্গত কারণে এখন প্রশ্ন ওঠে– বিশ্বব্যাপী প্রশাসন, রাজনীতি ও সমাজের সর্বস্তরে ঘুষের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণ কী? উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল ও স্বল্প-উন্নত দেশগুলোতে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চার মাত্রাবৃদ্ধি লক্ষ করে অনেকে দারিদ্রকেই ঘুষের চর্চা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখাতে চান। এদের বক্তব্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর নাগরিক সম্প্রদায়, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের অর্থ-বিত্ত তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে তারা তাদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির জন্য ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরা বলতে চান, দরিদ্র ছোট কর্মকর্তা ও কেরানিরা তাদের উপার্জনের দ্বারা সংসার চালাতে পারেন না বলেই তারা অবৈধ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ঘুষের মাধ্যমে তারা বাড়তি উপার্জন করতে চান। এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা যায় না। কারণ, দারিদ্রই যদি ঘুষের কারণ হতো, তাহলে উন্নত দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা থাকত না। কারণ, ওই সব দেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের উপার্জনের অর্থ দিয়ে স্বচ্ছন্দ্যে তাদের জীবন নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু ঘুষের সূচকে বিভিন্ন দেশের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখা যায়, অনেক উন্নত দেশে ঘুষচর্চার মাত্রা অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও অনেক বেশি। তবে কেবল উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ওইসব দেশে ঘুষের কারণ হিসেবে দারিদ্রকে গণ্য করা যায়, যেসব দেশে বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এমনভাবে বেতন নির্ধারণ করা হয়, যে বেতন তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য অপ্রতুল। এমন দেশের উদাহরণ হিসেবে আমরা অবশ্যই প্রথমে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করতে পারি। এখানে রাজধানী ঢাকায় বসবাসকারী একজন সরকারি অফিসের কেরানি যে বেতন পায় তা দিয়ে তার সংসার চালানো সম্ভব হয় না। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। ফলে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এখানে জান বাঁচাবার জন্য এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে সমাজে টিকে থাকার জন্য তাকে ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন বাড়াতে হয়। কিন্তু এ দেশে যারা উচ্চ বেতন পান, যারা তাদের উপার্জন দিয়ে সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন, তারা কি ঘুষ থেকে দূরে থাকেন? কাজেই বলা চলে, দারিদ্রই যদি ঘুষ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হতো তাহলে তো তাদের ঘুষ খাওয়ার কথাই নয়। লক্ষণীয়, দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন বাঁচাবার জন্য যারা ঘুষ গ্রহণ করেন তাদের ঘুষের পরিমাণ কম। কিন্তু বড় বড় রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীরা সাধারণত যেসব ঘুষের কাজে জড়িত হন সেগুলো অনেক বড়

অঙ্কের হয়ে থাকে। এরা জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ঘুষচর্চায় জড়িত হন না। এরা অসম সামাজিক প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির জন্য অবৈধ উপার্জন করে থাকেন। এরা এ অবৈধ উপার্জন পুনঃ বিনিয়োগ করে আরও সম্পদ বাড়িয়ে তোলেন। তাই দারিদ্র ঘুষের প্রধান কারণ নয়। বরং মানুষের অসম সামাজিক প্রতিযোগিতায় জড়িত হওয়া এবং রাতারাতি অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার বাসনাও তাকে ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট করে। তবে এ কথা সত্য যে, দারিদ্র দূর করত পারলে অনেক ছোট ছোট ঘুষ চর্চাকারী চাইলে ঘুষমুক্ত থাকতে পারতেন এবং পারেন।

বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সাধারণ মানুষ ঘুষকে খুব একটা অন্যায় মনে না করে উল্টো একে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মাচার ভাবেন। চলমান সামাজিক সংস্কৃতি ঘুষকে সমাজে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যেন এক প্রকার অঘোষিত সহায়তা দিচ্ছে। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত কার, কী আছে, অর্থাৎ কার কত সম্পদ আছে সে পরিমাপকে তাকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যক্তির অর্থবিত্ত ও সম্পদের রং বিচার করে তাকে মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে না। এর ফলে অবৈধ সম্পদ ও কালো টাকার মালিকগণ জনগণকে সামাজিক ঘুষ দিয়ে সমাজে মর্যাদা ক্রয় করতে পারছেন। বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে সহজ হতে পারে। যেমন, একজন কালো টাকার মালিক যদি সমাজে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে দেন, অথবা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেন, তাহলে সবাই তার প্রশংসা করেন। সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদা হঠাৎ বেড়ে যায়। কিন্তু তিনি যে অর্থব্যয় করে হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে অর্থ সহায়তা দিলেন, সে অর্থের রং পরখ করে কেউ তাকে প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। ফলে কালো টাকার মালিকগণ সেবকের মুখোশ পরে গণসেবার নামে নাগরিক সম্প্রদায়কে সামাজিক ঘুষ দিয়ে সহজেই সামাজিক মর্যাদা ক্রয় করতে সক্ষম হন। এ কালচার সবাইকে কালো টাকা উপার্জনে উৎসাহ প্রদান করার মধ্য দিয়ে ঘুষের চর্চা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ঘুষ নিয়ন্ত্রণের উপায়

ঘুষের চর্চা নিয়ন্ত্রণ করতে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ঘুষবিরোধী আইন তৈরি ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ঘুষখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে শুধু আইন করে এবং সে আইনের বাস্তবায়ন করে বা শাস্তি প্রয়োগ করে ঘুষের ব্যবহার কমানো সম্ভব নয়। কেননা ছোট ছোট পদে কর্মরত ছোট কর্মকর্তাগণ, যারা জীবন বাঁচাতে ঘুষ গ্রহণ করেন, তাদেরকে আইন করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে ঘুষ গ্রহণ করা থেকে ফেরানো যায় না। তার অর্থ এ নয় যে, ঘুষের বিরুদ্ধে আইন বা

শাস্তির দরকার নেই। অবশ্যই ঘুষবিরোধী আইন ও ঘুষ গ্রহণের জন্য শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এহেন ব্যবস্থা ঘুষখোরদের ওপর কিছুটা হলেও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তবে সবচেয়ে ভালো হবে, এব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকলপনা গ্রহণ করে যদি দেশবাসীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঘুষবিরোধী ও ঘুষ-ঘৃণাকারী মানসিকতা তৈরি করা যায়। এ কাজটি করতে পারলে একদিকে যেমন সহজে কেউ ঘুষের লেনদেনে জড়িত হতে চাইবে না, অন্যদিকে তেমনি ঘুষখোরেরাও আর অন্যদের কাছে ঘৃণার পাত্র হিসেবে পরিচিত বা বিবেচিত হয়ে অনেকটা সামাজিক বয়কটের মতো পরিস্থিতিতে পড়বে। এর ফলে ঘুষখোরগণ সমাজে বুক ফুলিয়ে চলতে না পেরে ম্রিয়মাণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে। এব্যাপারে শিক্ষা, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ধর্মকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ঘুষ নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা যায়। এছাড়া রাজনীতি ও প্রশাসনে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী ও ঘুষ গ্রহণকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কোণঠাসা করার উদ্যোগ নিয়ে ঘুষচর্চা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সৎ কর্মকর্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েও ঘুষচর্চা রোধে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে অন্য বড় বড় জাতীয় সমস্যাগুলোর ওপর যেখানে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদেরকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ঘুষকে জাতীয় সমস্যা মনে করে যদি এসমস্যার সমাধানকল্পেও স্কুল পাঠ্যক্রমে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করে কোমলমতি কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠদান করানো যায়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে তাদের মধ্যে ঘুষবিরোধী মানসিকতা তৈরি হতে পারে। ঘুষ যে চরম অন্যায় এবং একাজে জড়িত হওয়া যে গর্হিত অপরাধ, সে বিষয়টি কীভাবে শিশুদের মনে বদ্ধমূলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়– সে ব্যাপারে শিশু মনস্তাত্ত্বিক ও শিশু গবেষকদের গবেষণার সুযোগ রয়েছে। সরকার আগ্রহী হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে পারে।[৬]

শিক্ষার মতো ধর্মের সুপরিকল্পিত ব্যবহার নাগরিকদের মধ্যে ঘুষবিরোধী মানসিকতা তৈরিতে শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকগণ ধর্মবিশ্বাসী এবং তারা ধর্মের প্রতি দুর্বল ও সহানুভূতিশীল, সে কারণে এ ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার এসব দেশে ঘুষের মাত্রা হ্রাসে সুফলদায়ক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না; কারণ সকল ধর্মই অন্যায়বিরোধী। অবৈধ উপার্জনকে কোনো ধর্মই সমর্থন করে না। কাজেই মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা বা অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা পরিচালকগণ যদি ধর্মীয় বিধানানুযায়ী ঘুষখোরদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীদের অব্যাহতভাবে বারংবার ধারণা দিতে থাকেন তাহলে ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই এ অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসবেন। যতই ধর্ম-কর্ম

করা হোক না কেন, ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জন করলে যে সেই প্রার্থনা বা ইবাদত কোনো কাজে আসবে না– এ বিষয়টি যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালকগণ ধর্মবিশ্বাসীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন তাহলে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা ঘুষ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদানের সময় ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার এহেন পরামর্শ দেননি। এজন্য তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এশীয়-আফ্রিকীয় দেশগুলোর মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো নিবিড় নয়। তাদের মধ্যে ধর্মে অবিশ্বাসীদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশি। আর যারা ধর্মবিশ্বাসী, তাদের সঙ্গেও ধর্মের সম্পর্ক অনেকটা শিথিল। এশীয়-আফ্রিকীয় দেশগুলোতে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস শক্তিশালী হওয়ায় এঅঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকে ঘুষ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ প্রদানকালে যথার্থই ধর্মকে ব্যবহারের কথা বলেছেন। এ আলোচনায় মনে রাখা দরকার যে, ঘুষ একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ব্যাধি। শারীরিক ব্যাধির মতো একে চাইলেই দ্রুত সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। কাজেই এ ব্যাধিকে নির্মূল করার চেষ্টা না করে একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই অধিক জরুরি।

উপহার কি ঘুষ?

ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের চর্চাবিষয়ক অ্যাকাডেমিক আলোচনায় উপহারকে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা–সে বিষয়ে অ্যাকাডেমিকদের মধ্যে জোরালো বিতর্ক আছে। মধ্যযুগে আফ্রিকার দেশগুলোতে উৎকোচ প্রদানকে অন্যায় মনে করা হতো না। কোনো নেতাকে উপঢৌকন দেওয়া আফ্রিকীয় সমাজে গ্রহণীয় সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতো। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশেও অতীতে ঘুষকে খুব একটা ঘৃণার চোখে দেখা হতো না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোগল আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেলে সঙ্গে উপহার (যেমন 'নজরানা') নিয়ে যাওয়া গ্রহণীয় রেওয়াজ ছিল। কোনো সম্মানিত নেতা বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে ভালোবেসে বা শ্রদ্ধা করে উপহার দিলে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা–সে সম্বন্ধে দুর্নীতিবিষয়ক তাত্ত্বিকদের মধ্যে দুই রকমের মতামত রয়েছে। এক শ্রেণীর উদারপন্থী দুর্নীতি তাত্ত্বিকদের মতে, কেউ যদি কোনো নেতা বা উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ভালোবেসে বা শ্রদ্ধা করে তাকে কোনো উপহার দেন, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। একে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা না করাই ভালো। ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এমন উপহার তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর যুক্তিবাদী দুর্নীতি গবেষক এ রকম উপহারের দিকে সন্দেহের বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, কেউ যদি কোনো নেতা বা কর্মকর্তাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালোবেসে কোনো উপহার দেন, আর সেটাকে ঘুষ বলা হোক বা না হোক, এ ক্ষেত্রে উপহারদাতা ও উপহারগ্রহীতার সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্ব সতর্কতার সঙ্গে পরখ করে দেখতে

হবে। সংশ্লিষ্ট নেতা বা কর্মকর্তাকে ঐ উপহার প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে যদি তার কাছ থেকে সামান্যতম স্বার্থ হাসিলের কোনো লক্ষ্যও যদি সেই উপহারদাতার থাকে, তাহলে সেই উপহারপ্রদান অবশ্যই ঘুষ হিসেবে চিহ্নিত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমা

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানের রেওয়াজ প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। তবে নগদ অর্থ ছাড়াও ঘুষ বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় দামি উপহার, কোনো সুযোগ সুবিধাপ্রদান বা অন্য কোনো সেবা বা সুবিধাদানের মাধ্যমেও ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। একেক সমাজে ঘুষের লেনদেন হয় একেকভাবে। তবে সব সমাজেই ঘুষের লেনদেন ও চর্চায় কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখার রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অফিস-আদালতে সিসি-টিভি ক্যামেরার ব্যবহার জনপ্রিয়তা পাওয়ায় সতর্ক ঘুষ গ্রহণকারী এবং প্রদানকারীগণ অফিসকক্ষকে ঘুষগ্রহণের যোগ্য স্থান মনে না করে পরিবর্তে অফিসের বাইরে কোনো রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোনো স্থানকে নিরাপদ মনে করছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন এসেছে। এক সময় ঘুষ গ্রহণকারীগণ ঘুষের টাকা বাম হাত দিয়ে গ্রহণ করতেন। অনেকে আবার ঐ টাকা স্পর্শ না করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্রদানকারীকে সেখানে ঘুষের টাকা রেখে দিতে বলত। এ কাজ তারা সারত খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে। কিন্তু সম্প্রতি ঘুষের চর্চা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ঘুষগ্রহণকারীগণ এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর অতটা গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করছে না। উল্টো প্রকাশ্য দিবালোকে তারা লোকজনের সামনে ঘুষের অর্থ গ্রহণে দ্বিধা করছে না। লক্ষণীয়, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ এককভাবে দুর্নীতি করার পরিবর্তে দুর্নীতির চক্র তৈরি করে একসঙ্গে ভাগাভাগি করে ঘুষ খাওয়াকে কিছুটা নিরাপদ মনে করে, সেহেতু অফিসের অন্য সহকর্মীদের সামনে ঘুষসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলাপ-আলেচনা বা ঘুষের অর্থ গ্রহণে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কোনো সংকোচ বোধ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সামনেই তারা সেবা গ্রহণকারীদের সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের সময় ও ঘুষের অঙ্কসম্পর্কিত আলাপ সেরে নেয়। তবে বহিরাগত বা অপরিচিত লোকজন থাকলে এব্যাপারে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের আচরণ কিছুটা ভিন্ন রকম হয়।

ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমা ও চর্চা অনেকটা সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম চর্চার মতো। প্রায়োগিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা না থাকলে ঘুষ লেনদেনের চর্চা, ভঙ্গিমা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

অনুধাবন করা কঠিন। এই লেনদেনের বোঝাপড়া সম্পন্ন করতে ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী– উভয়কেই যথেষ্ট ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। তাড়াহুড়ো না করে এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে ধীরে-সুস্থে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। যেমন, রেজিস্ট্রি অফিসে বা থানায় কেউ কোনো কাজ করার জন্য গিয়ে কখনোই সাধারণভাবে বলেন না, আমার কাজটা করে দিন; বরং বলেন, আমার এ কাজ করে দিন, আমি আপনাদেরকে এত টাকা ঘুষ দেব। ঘুষ প্রদানের জন্য এ রকম সরাসরি বক্তব্য দিলে কোনো কাজ আদায় করা সম্ভব হয় না। কারণ ঘুষ আদান-প্রদানের কাজটি অন্যায় হলেও এ কাজের একটা ভদ্র ও শালীনতাগত দিক আছে। এ ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানকারীকে সংশ্লিষ্ট অফিসের সংস্কৃতি, নিয়মাচার, আদব-কায়দা ও বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ঘুষের চলমান বাজারদর সম্বন্ধে জেনে নিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতে হয়। এ ইঙ্গিত ঘুষ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকেও অত্যন্ত শালীনভাবে দেওয়া হতে পারে। পরে উভয়পক্ষের দেওয়া ইঙ্গিতে সাদৃশ্য থাকলে আর কাজ করতে অসুবিধা হয় না। তখন সেবা গ্রহণকারীর ফাইলটি এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ায় অসুবিধা হলে সেবাগ্রহণকারীর ফাইল অন্য অনেক ফাইলের নীচে চাপা পড়ে যায়। অসমঝোতার ঐ ফাইল খুঁজে পেতে অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে এবং তার পরেও হতে পারে নানা রকম ঝুট-ঝামেলা এবং বিলম্ব। কাজেই যারা অফিস-আদালতে সবসময় কাজকর্ম করেন, তারা সংশ্লিষ্ট অফিস-আদালতের নিয়মাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারা সেভাবেই পেশাদার শিল্পীর মতো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক নির্মাণ করে তাদের কাজ এগিয়ে নিতে পারেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিশেষ পারদর্শী। তারাও পেশাদারি আচরণের মাধ্যমে তাদের ক্লায়েন্ট বা মক্কেলদেরকে লেনদেনের সম্পর্কে জড়িত হতে সহায়তা প্রদান করেন।

ঘুষের পরিভাষা

সাধারণ মানুষ ঘুষকে ঘুষ বললেও ঘুষ প্রদানকারী বা গ্রহণকারীগণ কিন্তু একে ঘুষ বলতে চান না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুষচর্চায় জড়িতগণ ঘুষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। একারণে দেশে-দেশে ঘুষের বিভিন্ন রকম পরিভাষা গড়ে উঠেছে। ঘুষের পরিভাষার যুগ বা সময়ভিত্তিক ভিন্নতাও লক্ষণীয়। যেমন, এ উপমহাদেশে মোগল আমলে রাজকর্মচারীদেরকে খুশি করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত ঘুষকে 'নজরানা' বা 'সেলামি' নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু এখন সরকারি কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঘুষকে 'নজরানা' বা 'সেলামি' না বলে অনেকক্ষেত্রেই 'পারসেন্টেজ' বা 'সম্মানী' বলা হচ্ছে। বেশ কিছু এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশে ঘুষকে 'বকশিশ' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কর্মকর্তা সেবাগ্রহীতার কাজ করে দিলে সেবাগ্রহীতা খুশি হয়ে কর্মকর্তাকে কিছু

দিচ্ছেন, যা বকশিশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাকিস্তানসহ কিছু এশীয় দেশে আবার ঘুষকে 'চায়ে-পানি' বলা হয়। অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাকে নির্বিঘ্নভাবে দ্রুত সেবা দিলে তিনি সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাকে চা-পানি খেতে কিছু দিচ্ছেন। ভারতের কিছু অংশে 'স্পিড মানি' এবং অন্য কিছু অংশে 'খিলানা পারা' হিসাবে ঘুষের পরিচিতি রয়েছে। অর্থাৎ সেবাগ্রহীতা কিছু দিলে তার কাজের 'স্পিড' বা গতি বাড়ছে, অথবা সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাদেরকে খাওয়ার নামে কিছু দিলে সহজে কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভারতের 'খিলানা পারা'র সঙ্গে থাইল্যান্ডের ঘুষের পরিভাষা 'কিন মানি'র সাদৃশ্য রয়েছে; যার অর্থ খাওয়ানোর জন্য প্রদত্ত অর্থ। জাপানের ঘুষের পরিভাষা 'সিটো ফুমেকিন'-এর অর্থ হলো এমন ব্যয়, যা ব্যক্ত করা যায় না (আনএক্সপ্লেইনড এক্সপেনসেস)। ল্যাটিন আমেরিকার ঘুষের পরিভাষা 'লা মোরদিদা' এবং ইতালির ঘুষের পরিভাষা 'লা বাস্টারেল্লা'-র অর্থ যথাক্রমে 'ছোট্ট কামড়' এবং 'ছোট ইনভেলাপ'। অস্ট্রেলিয়ায় 'ব্রাউন পেপার ব্যাগ' এবং পশ্চিম আফ্রিকায় 'ড্যাস' ঘুষের পরিভাষা হিসাবে পরিচিত। ফিলিপাইনের ঘুষের পরিভাষা 'লাগে' কাজের গতি-বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ঘানার ঘুষের পরিভাষা 'রেট মানি' নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত অবৈধ ব্যয়কে বুঝায়। চীনের ঘুষের পরিভাষা 'সৌউহুই' এবং 'ব্যাক ডোর' যথাক্রমে সরকারি পদমর্যাদা ব্যবহার করে অবৈধ উপার্জন এবং অবৈধ মুনাফার লক্ষ্যে অবৈধ প্রদানকে বুঝায়। ঘুষের পরিভাষা অনেক সময় পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গড়ে ওঠে। যেমন আমেরিকার যৌনকর্মীরা আইনের হাত থেকে অবৈধ রক্ষা পেতে যে ঘুষ প্রদান করেন, তাকে বলা হয় 'প্রটেকশন মানি'। এছাড়া ফ্রান্সে 'সোলস লা টেবল' (টেবিলের নীচ থেকে), তুরস্কে 'রুশভেত' (বকশিশ), তাইওয়ানে 'হুং বাও' (লাল খামে অর্থপ্রদান), দক্ষিণ কোরিয়ায় 'চুন চোজ' (হালকা/হাল্কা কর) এবং আরো অনেক দেশে ঘুষের বিচিত্র রকম পরিভাষা রয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ঘুষ চর্চাকারীদেরকে পাকড়াও করার জন্য পরিদর্শন ও সারভিলেন্স কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে ঘুষ আদান-প্রদান ভঙ্গিমায় যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি ঘুষের লেনদেনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নতুন নতুন ঘুষের পরিভাষা।

বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ভয়াবহ প্রসারের সঙ্গে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চায়ও ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন বিভিন্ন দেশে নিত্য-নতুন আইন এবং নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠছে, বাড়ছে সারভিলেন্স, মোবাইল ট্রাকিং, সিসি-টিভি ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, তেমনি এসব আইন, সংস্থা ও প্রযুক্তিকে ফাঁকি দিয়ে দুর্নীতিবাজেরা এবং ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকারীগণও নিত্য-নতুন কৌশলে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং দুর্নীতি ও ঘুষ নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপের কারণে দুর্নীতি-সাহিত্যে দুর্নীতি ও ঘুষচর্চার নিত্য-নতুন ভঙ্গিমার উপস্থিতি ও সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে ঘুষের নতুন নতুন পরিভাষা। দুর্নীতিসংক্রান্ত গবেষকগণও

এদিকে মনোযোগ রাখছেন এবং সময়মত তারা ঘুষের নতুন পরিভাষাগুলোর অর্থ, ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিত উদ্ঘাটন করে তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছেন।

উপসংহার

সমাজ, প্রশাসন ও রাজনীতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির মতো ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা আদিকাল থেকে বিভিন্ন স্বরূপ, ভঙ্গিমা ও মাত্রায় বিদ্যমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাত্রা বৃদ্ধির কারণে সুশাসনের পথে হুমকি সৃষ্টি করায় ঘুষ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশ্বব্যাপী গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। অনেক দেশেই ঘুষকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণে যতটা মনোযোগ এবং অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, ঘুষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী দেশে-দেশে ঘুষের ব্যবহার বর্তমানে মাত্রাভেদে সমাজের সকল আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ঘুষ একটি আগ্রহের গবেষণার স্থান হলেও এবং এ বিষয়ে অনেক গবেষণা কাজ প্রকাশিত হলেও সমাজবিজ্ঞানীরা ঘুষের সকল এলাকায় সমান গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা কাজ করেননি। ঘুষের লেনদেন ভঙ্গিমা ও পরিভাষার ওপর সমাজবিজ্ঞানীরা দুর্নীতি সাহিত্যে অপ্রতুল আলোকপাত করেছেন। ঘুষ সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসেবে প্রাদুর্ভূত হওয়ায় বিভিন্ন দেশে এর অস্তিত্বের মাত্রা ও চর্চা পরিমাপ করে আন্তর্জাতিকভাবে ঘুষের সূচক (ব্রাইবারি ইনডেক্স) প্রকাশ করা হচ্ছে।

দারিদ্রের কারণেই শুধু ঘুষের চর্চা হয় না এবং বাড়ে না। অসম সামাজিক প্রতিযোগিতা ও রাতারাতি অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার বাসনা মানুষকে ঘুষচর্চায় আকৃষ্ট করে। উন্নয়নশীল দেশে ঘুষকে অন্যায় বিবেচনা না করে স্বাভাবিক জীবনাচার হিসেবে গণ্য করা হয়। দুর্নীতিবান্ধব সংস্কৃতি সামাজিক ঘুষপ্রদানের মাধ্যমে ঘুষখোরদের সামাজিক মর্যাদা ক্রয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আইন তৈরি করে বা শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে ঘুষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধর্মের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে ঘুষের চর্চা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। উপহারপ্রদানকে ঘুষ মানতে অনেকে রাজি না হলেও প্রদত্ত উপহারের পেছনে আনুকূল্য লাভের বাসনা থাকলে তা ঘুষ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সূক্ষ্ম শিল্পচর্চার মতো ঘুষের লেনদেন কাজে যুগপৎ শালীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষার রেওয়াজ রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ফলে ঘুষের লেনদেনে সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকারীগণ ঘুষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করায় বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঘুষের বিভিন্ন রকম পরিভাষা গড়ে উঠেছে। সমাজ গবেষকগণ তাদের গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে এসব পরিভাষার জন্মবৃত্তান্ত ও পরিচিতি নাগরিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে তুলে ধরছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. এ ধরনের কয়েকটি কাজের জন্য দেখা যেতে পারে, Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis* (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970; ames C. Scott, *Comparative Political Corruption* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, 1972); Arnold A. Rogow & Harold D. Lasswell, *Power, Corruption and Rectitude* (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, 1963); George Benson, *Political Corruption in America* (Lexington: Lexington Books, 1978); Ledivina V. Carino (ed.), *Bureaucratic Corruption in Asia: Causes, Consequences, and Controls* (Quezon City: The Philippines: JMC Press, 1986); Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988); Robert Williams, *Political Corruption in Africa* (Hampshire, Gower, 1987);Surendranath Dwivedy & G. S. Bhargava, *Political Corruption in India* (New Delhi: Popular Book Services, 1967); Susan Rose-Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy* (New York: Academic Press, 1978); Muhammad Yeahia Akhter, *Electoral Corruption in Bangladesh* (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2001); 'Styles of Administrative Corruption: The Case of a Bangladeshi Organization', *Politics, Administration & Change*, vol. 12, no. 1, 1987, pp. 61-76; মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* (ঢাকা: নিবেদন পাবলিকেশন্স, ১৯৯১); 'দুর্নীতি ও উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ', প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা: ৪৯-৬২; 'প্রশাসনিক দুর্নীতি দমন', প্রশাসন সমীক্ষা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা: ৫৬-৮৬।

২. ঘুষের ওপর এ রকম কিছু গবেষণা কাজের নমুনা হিসেবে দেখা যায়, R. K. Soonavala, *The Law Relating to Bribery and Corruption* (Bombay: N. M. Tripathi Pvt. Ltd., 1964); Neil Jacoby, Peter Nehemkis and Richard Eells, *Bribery and Extortion in World Business* (New York: Macmillan, 1977); John T. Noonan, Jr., *Bribes* (New York: Macmillian, 1984); Gautam Bose, 'Bureaucratic delays and bribe taking', *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 54, issue: 3, 2004, pp. 313-320;

Richard L. Cussin, *Bribery Abroad: Lessons from the Foreign Corrupt Practices Act* (Lulu com : 2008); Richard L. Cussin, *Bribery Everywhere : Chronicles from the Foreign Corrupt Practices Act* (Lulu com : 2009); Martin T. Biegelman & Daniel R. Bieqelman, *Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook: Protecting Your Organization from Bribery and Corruption* (Wiley: 2010); Brain P. Loughman & Richard A. Siberty, *Bribery and Corruption: Navigating the Global Risks* (Wiley: 2011); Julie Marie Bunck & Michael Ross Fowler, *Bribes, Bullets, and Intimidation: Drug Trafficking and the Law in Central America* (Pensylvania: Pensylvania State University Press, 2012); Michael J. Comer & Timothy E. Stephens, *Bribery and Corruption* (Aldershot: Ashgate, 2013); Taras Fedirko, "I'd Rather Pay" : Bribery and Informal Practices in Ukrinian Bureaucracy,' *Student Anthropologist*, vol. 3, issu: 2, 2013, pp. 61-84.

৩. এই জাতীয় সংসদ সদস্যের নাম মেজর (অব.) বজলুল হুদা। তিনি ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান-বৈষম্য আলোচনাপ্রসঙ্গে এ তথ্য উপস্থাপন করেন। উক্ত আলোচনায় আরও কয়েকজন সংসদ সদস্য জানান, মন্ত্রীরা বিশেষ বিশেষ এলাকার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন এবং তার জন্য পারসেন্টেজ নিচ্ছেন। (তথ্য সংগৃহীত, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* ঢাকা: নিবেদন পাবলিকেশন্স, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫৭; ৮৬)।

৪. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে, Mahfuzul H. Chowdhury, 'Violence, Politics and the State in Bangladesh', *Conflict, Security & Development*, Vol. 3, No. 2, 2003, pp. 265-276.

৫. তথ্য সংগৃহীত, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন রাজনীতি: একটি গ্রামভিত্তিক নিরীক্ষণ', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ* (সমাজ বিজ্ঞান), খণ্ড ৮, সংখ্যা ১, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২০৯-২৩৪।

৬. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে একটি প্রস্তাব', *টিআইবি নিউজলেটার*, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মার্চ ২০০০।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: তাত্ত্বিক এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান*

Abstract

There are some ideological trends or psychological attributes among the people in every political system. Culture is composed by them. The attitudes, beliefs, values, sentiments and skills of the people in the society are the contributing factors of culture. These composing factors of culture also contribute to the political behaviour and resulting the political culture and political culture reflects in the national character of every nation. As a result, the cherished desire for democracy of a nation can be traced by its political culture. So, the study of the political culture especially culture of democracy has becoming a significant unit of contemporary political analysis of developing countries along with the developed political systems. In order to build up democracy from the root and to sustain it, democratic culture and process is particularly required. Because, democratic culture is such a condition where democracy grows up, develops and sustains. Democracy in Bangladesh is passing its formatting stage as a country of developing nations. In this regard, it is awfully significant to know the democratic culture of Bangladesh. This article attempts to analyse the culture of democracy in Bangladesh in the light of psychocultural theoretical approach.

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বিশ্বে 'গণতন্ত্র' শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। অধিকাংশ সরকারই 'গণতন্ত্র' বিষয়টিকে "বৈধতার সূক্ষ্ম প্রভা" (aura of legitimacy) হিসেবে ব্যবহার করেন। গণতান্ত্রিকায়নের আধুনিকীকরণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে গণতন্ত্রের প্রথম প্রবাহেই (first wave of democratization) শিল্পায়িত ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকায়নের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে এবং সেসব সমাজে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এবং এসব রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসনের করায়ত্ত থাকার কারণে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সামিল করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শাসন ব্যবস্থার ধরন হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে

* সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ১৩৪২

কার্যকর করার ক্ষেত্রে এসব দেশ তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি। কারণ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনার বিষয়টি উক্ত সমাজের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কোনো জনগোষ্ঠীর পূর্ব-পুরুষদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তাদের বর্তমানকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অনুশীলন ব্যতীত একদিনে বা কিছু দিনে গণতন্ত্র অর্জন করতে পারে না, বরং গণতন্ত্র শতশত বছরের চর্চা ও বিকাশের ফল। কিন্তু এসব দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত ধারা তেমনটা গড়ে উঠে নি। এরূপ কতিপয় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, তবে তার নৈপুণ্য নিম্নমানের (low performance)। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত না হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এসব দেশের অধিকাংশ দেশে অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের প্রকাশ ঘটেছে এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের জনগণের হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। ঐতিহাসিক কালপর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রয়াস এবং বিচ্যুতির (trial and error) মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ব্যাকরণসম্মতভাবে বা প্রথাসিদ্ধভাবে আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা সিভিক কালচার গভীরভাবে শিকড় গাড়ে নি। তবু গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বাঙালির মানসে জেঁকে বসে আছে। বাঙালির চেতনায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রবেশের কারণেই বৃটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু গণতান্ত্রিক ধারার সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালির এই গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের আরও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষণীয় উদ্যোগও অব্যাহত। এই প্রেক্ষাপটে একটি উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রকাঠামো হিসেবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ধারাটি কীভাবে সাধিত হচ্ছে এবং এ ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাড়া প্রদানের মাত্রা কতটুকু–তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। আর এ জিজ্ঞাসা থেকেই বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টিকে এ প্রবন্ধের মুল আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র নতুন কোনো বিষয় নয়। কারণ গ্রিক দার্শনিক হতে শুরু করে আধুনিককালের তাত্ত্বিকদের আলোচনাতেও গণতন্ত্রকে একটি মুখ্য শাসনব্যবস্থা হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে। স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকাল থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আগ্রহ আরো বেড়েছে। যার প্রধান প্রমাণ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সব দেশ সমানভাবে সাড়া প্রদান করতে পারে নি। অর্থাৎ কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্র সফল হচ্ছে আবার কোনো কোনো দেশে হচ্ছে না। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে (democratic culture) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন। বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় ধরনের সমাজে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের উপযোগী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হলো এমন এক প্রকার সংস্কৃতি, যা গণতন্ত্রের আদর্শকে লালন করে এবং তার বিকাশ ঘটায়। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকগণ গণতন্ত্র সফল হবার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতির বিশ্লেষণ শুরু করেন। বিশেষ করে ষাট ও সত্তরের দশকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বও গড়ে উঠে। অ্যালমন্ড (Almond), ভারবা (Verba), পাই (Pye), ডাইমন্ড (Diamond), লিপসেট (Lipset), নাই (Nie), কিম (Kim) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অনুরূপ ধরনের গণতান্ত্রিক, যৌক্তিক ও অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি বিশ্লেষণের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (intellectual history) মূলত গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল স্থিতিশীল গণতন্ত্র (stable democracy) প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু আচরণ (norms) ও প্রথার (customs) কথা উল্লেখ করেন; তিনি গণতন্ত্রকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (values and outlook of a middle class) হিসেবে বিবেচনা করে তার সাহায্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন।

অষ্টাদশ শতকে চার্লস দ্বিতীয় লুই এবং মন্টেস্কু-কে সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্থাপক (founder) হিসেবে দেখা যায়। মন্টেস্কুর *The Spirit*

of Laws গ্রন্থে একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রা, স্বাধীনতা, ধর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আচার-প্রথা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি একতা (integrity) এবং আস্থাভাজনতাকে (trustworthiness) গণতন্ত্রের কার্যকর মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মন্টেস্কুর পথ ধরেই ক্রমে রুশো, স্টেইল, বেনজামিন, কনস্টান্ট, গাইজট এবং টকবিল বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনৈতিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা করেন। Alexis D. Tocqueville সর্বপ্রথম ক্ল্যাসিক্যাল সমাজতাত্ত্বিক, যিনি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *Democracy in America* গ্রন্থে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কথা বলেন। সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে জার্মান তাত্ত্বিকদের অবদানও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে কান্ট, হেগেল, মার্ক্স, ম্যাক্সওয়েবার প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরে তা অনেক আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী যেমন, ট্যালকট পারসন্স, এডওয়ার্ড শিলস প্রমুখের মধ্যেও দেখা যায়। এসব তাত্ত্বিকগণ মানুষের আচরণ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে অ্যালমন্ড, ভারবা, পাই প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তবে এক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে অ্যালমন্ড ও ভারবার *The Civic Culture* (1963) গ্রন্থটি, যেখানে স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও আচরণগত ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে সংস্কৃতির মাধ্যমে রাজনীতি বিশ্লেষণের এ তত্ত্ব সমালোচিত হয়। কিন্তু ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে আবার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে হান্টিংটনের The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর এবং সোভিয়েত ও পূর্ব-ইউরোপের পতনের ফলে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ধারা সূচিত হবার পর থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ বর্তমানে আবার কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে ব্যক্তি যে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বসবাস করে তার অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধগত বিষয়ের প্রতি জ্ঞাত সাড়া প্রদানকে (learned response) বোঝায়। Almomd ও Verba তাদের *The Civic Culture* গ্রন্থে বলেছেন, স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গবেষকদ্বয় পাঁচটি জাতির (আমেরিকা, ব্রিটেন, মেক্সিকো, জার্মানি ও ইতালি) উপর তুলনামূলক গবেষণা করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কতিপয় উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। উক্ত উপাদানগুলোকে তাঁরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি না বলে পৌর-সংস্কৃতি (civic culture) বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁরা রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা, পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগিতার মনোভাব, রাজনৈতিক জীবনে যৌক্তিক অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে পৌর-সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তখনই যখন অংশগ্রাহক সংস্কৃতি (participant political

culture) এবং প্রজাসুলভ সংস্কৃতির (subject political culture) মধ্যে সমন্বয় ঘটে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মকাণ্ডে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। Jean Baechler তাঁর *Democracy: An Analytical Survey* গ্রন্থে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে কতিপয় নাগরিক গুণাবলির (civic virtues) সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে সহনশীলতা (tolerance), স্বাধীনতা (freedom) ও অহিংসা (non-violence)-এর মতো গুণাবলির উপস্থিতি অন্যতম।

বর্তমান প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল উপাদান বা চালক হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে: (১) সহনশীলতা; (২) পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; (৩) সহযোগিতার মনোভাব; (৪) সমঝোতা ও ঐকমত্য; (৫) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন; (৬) গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; (৭) নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা; এবং (৮) রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন।

১. সহনশীলতা

রাজনীতিতে সহনশীলতা বলতে ব্যক্তিবিরোধী মতামত, নেতৃত্ব ও কর্মকাণ্ডকে কতটুকু সহ্য করতে পারে তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের উদারনৈতিক ও বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজনৈতিক কাঠামোতে যে মূল্যবোধ ও বিশ্বাস (values & beliefs) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তার মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি (democratic culture) অন্যতম। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ধারণ করার জন্য জনগণ ও এলিটদেরকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ করতে হয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোর মধ্যে সহনশীলতা (tolerance) অন্যতম। সহনশীলতা হলো এমন এক প্রকার গুণ যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গে অন্যের বিশ্বাস ও মূল্যাবোধের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তার শান্তিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ সহনশীলতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনে 'সহনশীলতা' শব্দটি প্রথম গুরুত্বসহকারে আলোচনায় স্থান পায় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের (Religious War) সময় যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি বিশেষ ধর্মের একক আধিপত্যের পরিবর্তে সহনশীলতার ভিত্তিতে সাধারণ (common) ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। বর্তমানে সহনশীলতা শব্দটি উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সহনশীলতাকে রাজনৈতিক বিশ্বাসের (political beliefs) একটি দৃষ্টিভঙ্গি (orientation) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। সহনশীলতার প্রবক্তা-তাত্ত্বিকদের মধ্যে স্পিনজা (Spinoza), লক (Locke), ভলতেয়ার (Voltaire), মিল (Mill), রুশো (Rousseau) এবং কোঁৎ (Comte)

অন্যতম। নৈতিক ও দার্শনিক (moral & philosophical) মানদণ্ডের পাশাপাশি রাজনৈতিক আচরণের মানদণ্ডেও সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সহনশীলতা বলতে একজন নাগরিক কর্তৃক অন্য নাগরিকের রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকে বোঝায়, যেখানে নাগরিকগণ পরস্পরের মতের বিরোধিতা করতে পারে এবং তা সহনীয় এবং স্বীকৃত। বস্তুত গণতন্ত্রের স্থিতি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সর্বতোভাবে নির্ভর করে রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিকের সহনশীল মনোভাব ও আচরণের উপর। রাজনৈতিক সহনশীলতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; এগুলো হলো: ব্যক্তি বিরোধী দল বা মতকে কতটুকু সহ্য করতে পারে; বিরোধী কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করে; এবং ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণগত সহনশীলতা।

বিরোধী দল বা মতের প্রতি সহনশীলতা (tolerance of opposition) হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিরোধী (opposition) বলতে একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলকে বোঝায়, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থেকে সরকারের কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করে। Dictionary of Politics-এ বিরোধী বা অপজিশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "A loose association of individuals or political group or party wishing to change the government and alter its policy decisions." একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী শক্তি (opposition force) সেটি দল বা মত– যাই হোক না কেন, যখন সেটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তখনই গণতন্ত্র কার্যকর হয়। কারণ গণতন্ত্রের সার্থকতা এখানেই যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধিতা ও সমালোচনা করার অবাধ সুযোগ থাকে। শক্তিশালী বিরোধী দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর এবং বাইরে থেকে সমালোচনা করে সরকারের দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট করে তুলতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী দলের ভূমিকাকে সঠিকভাবে লালনের জন্য বিভিন্ন আইনগত সুযোগ (various legislative devices) সৃষ্টি করে দেয়। এই legislative devices বিরোধী দল ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। সরকারের ভুলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং জনমতকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এর ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের রায় চায় এবং জনগণও সরকারের কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়নের সুযোগ পায়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল বা মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রের অন্যতম তাত্ত্বিক Larry Diamond-এর মতে, গণতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধী শক্তির উপস্থিতি

(opposition force) থাকে না সেখানে কোনো গণতন্ত্র থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভিন্নমত এবং তার প্রতি সহনশীলতা (tolerance of opposition) হলো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। James L. Gibson ও তাঁর সহযোগী লেখকগণ বলেন, "Without tolerance of opposition, widespread contestation is impossible, governmental legitimacy is imperilled and a lack of conformity becomes prevalent." Earnest Barker-এর মতানুসারে, democracy liberates opposition as 'anti-thesis', যার কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, বিরোধী দল বা মতের উপস্থিতি। এই opposition-এর অস্তিত্ব নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা কিংবা মন্ত্রিপরিষদের মধ্যেও থাকতে পারে। তিনি opposition-কে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'safety valve' হিসেবে অভিহিত করেছেন। গণতন্ত্র হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন দলের কর্মকাণ্ডের পথ অবারিত থাকে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশই কেবল এসব আদর্শকে লালন করতে পারে। উল্লেখ্য, গণতন্ত্র সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা ঠিকই, কিন্তু তার পূর্বশর্ত অনেক। এর মধ্যে একটি পূর্বশর্ত হলো বিরোধী দল বা বিরোধী গ্রুপের কার্যক্রমের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ গণতন্ত্রে বিরোধ থাকবে এবং তার ভিত্তিতে রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলোর মীমাংসা হবে। Michael Curtis বলেছেন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে একটি বৈধ ও শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে। সংসদ বা পার্লামেন্ট শুধু তাকে সহ্যই করবে না বরং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করারও সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এবং পার্লামেন্টে এর জন্য কিছু সময়ও মঞ্জুর করবে। সুতরাং দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম শর্ত হলো বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি আস্থা এবং তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন। একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী মত বা পক্ষকে যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করাটাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণগত সহনশীলতা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

২. পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদান হলো পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। এটি বলতে ব্যক্তির মধ্যে একে অন্যের প্রতি বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে বোঝানো হয়। গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য যেমন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন, তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের মধ্যে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এ

মূল্যবোধগত গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব মূল্যবোধগত বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। এসব গুণ যখন মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস-ব্যবস্থায় (political beliefs system) বিধিবদ্ধ কিংবা স্থায়ী রূপ ধারণ করে তখন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয় এবং গণতন্ত্র কার্যকর রূপ লাভ করে। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়কে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক মূলধন (cultural capital) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ বলতে বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারের কর্মকাণ্ড ও অন্যের মতামতের প্রতি trust-কে বোঝানো হয়েছে। এসব বিষয়কে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে trust & obedience কেবল civic association বিনির্মাণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ব্যক্তির রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ও কার্যকারিতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকে তাহলে গণতন্ত্র কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না।

৩. সহযোগিতার মনোভাব

সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে গণতন্ত্র যেমন বিকশিত হতে পারে না তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও বিকশিত হতে পারে না। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব একান্ত অপরিহার্য। আধুনিক মানুষ যেমন সামাজিক জীব তেমনি রাজনৈতিক জীবও। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে যেমন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজে বসবাস করতে হয় তেমনি রাজনৈতিক জীব হিসেবেও সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করতে হয়। সহযোগিতার বন্ধনকে অবলম্বন করেই মানুষ আদিকাল থেকে আধুনিকপর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছে। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেদে সহযোগিতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সহযোগিতার মাত্রাগত ভিন্নতা কিংবা তারতম্য যাই হোক না কেন, মানুষ তার চিরন্তন স্বভাবগত আচরণের কারণেই পরস্পরকে সহযোগিতা করে। *International Encyclopedia of Social Science*-এ বলা হয়েছে, "Cooperation is joint or collaborative behavior that is directed towards some goal and in which there is common interest or hope of reward." একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি পরস্পরকে সহযোগিতা করার মনোভাব বিকশিত না হয় তাহলে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কারণ, গণতন্ত্র টিকে থাকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। মৌলিকত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্র হলো সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে সমাজে বসবাসকারী

বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে। Diamond বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহের (elements) মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু কীভাবে এই গণতান্ত্রিক অভ্যাস (democratic practices) নাগরিকদের মধ্যে বিকশিত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, নিয়ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের জীবন বোধে একটি পরিবর্তন সাধিত হওয়ার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়, "Democracy does not mean only members. In democracy you will have to give and take. Democracy means agreement between people and friendship and cooperation."

৪. সমঝোতা ও ঐকমত্য

সমঝোতা ও ঐকমত্য বলতে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করা ও তদনুসারে আচরণ করাকে বোঝায়। গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন (rule by the people)। কিন্তু জনগণ শাসন করে না। তারা শাসন করার জন্য মত দেয়। তার ভিত্তিতে শাসকবর্গ ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম দুটো শর্ত হচ্ছে– জাতীয় এবং মৌলিক বিষয়ের সমঝোতা (compromise) ও ঐকমত্য (consensus) প্রতিষ্ঠা করা। হান্টিংটন (Huntington) বলেন, "অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ হিংস্রতা কম। কিন্তু গণতন্ত্রে শুধু আপোষ বা সমঝোতাই (compromise) থাকে না, দ্বন্দ্বও থাকে; যে কারণে গণতন্ত্রকে একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা (conflictual condition) হিসেবে মনে করা হয়। তবে গণতন্ত্রে এই দ্বন্দ্ব মীমাংসা হয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে।" অ্যালমন্ড ও ভারবার মতে, গণতন্ত্রে দ্বন্দ্ব থাকবে কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত নয়, এখানে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু তা থাকবে গ্রহণীয় চৌহদ্দির মধ্যে; গণতন্ত্রে বিভক্তি থাকবে তবে তার প্রশমন হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সারতরি (Sartori) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং ঐকমত্য– এ দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, "মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব গণতন্ত্রের এমনকি কোনো ব্যবস্থারই সম্ভাব্য ভিত্তি হতে পারে না।" রবার্ট ডাল (Robert Dahl) ঐকমত্যের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র মূল্যবোধগত ঐকমত্যে স্থিরতা লাভ করে (anchored to value consensus)। তিনি আরও বলেন, "ঐকমত্য যত বেশি হবে গণতন্ত্র তত সফল হবে।" সুতরাং দেখা যায় যে, সমঝোতা ও ঐকমত্য গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশেষ করে জাতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য জরুরি।

৫. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন

ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে শুরু করে রাজনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার মাত্রাকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি বলতে জনগণ কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং গণতন্ত্রকে তারা কতটুকু সমর্থন করে ও মূল্যায়ন করে– তা বোঝানো হয়ে থাকে। রাজনীতি হলো এক প্রকার মানসিকপ্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে রাজনীতির ভাবনার প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে। একই কারণে রাজনৈতিক ক্রিয়া (political action) সম্পাদন কিংবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির (political orientation) ক্ষেত্রেও সমাজ ভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি। রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্টের কারণেই মানুষের মধ্যে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠে। পৃথিবীর সকল সমাজেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মানুষের এই যে পৃথক পৃথক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি– এটিকে তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের এ প্রকাশ প্রতীকী (symbols) আকারেও হতে পারে, যার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র এবং রাজনৈতিক পছন্দের বিষয়টি উন্মোচিত হয়। আবার রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। শাসনব্যবস্থা পছন্দের বিষয়টি তাই নির্ভর করে কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। Almond and Verba বলেন, "When we speak of political culture of a society, we refer to the political system as internalized in the cognitions, feelings, and eveluations of its population." প্রসঙ্গত, Tolcott Parsons and Edward Shills রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তা হলো: (১) cognitive orientation; (২) affective orientation; ও (৩) evaluative orientation।

একটি সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো কী রকম হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ঐ সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। Almond and Verba তাই রাজনৈতিক কাঠামোকে সংস্কৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, একটি জাতি বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি রাষ্ট্রের সদস্যগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির নমুনার নির্দিষ্ট বণ্টন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে একটি বিশেষ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। Almond and Power বলেছেন যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ (objects) সম্পর্কে ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

৬. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলে যেমন গণতন্ত্র বিকাশিত হয় না তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠতে পারে না। অবশ্য মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিষয়টি পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। কারণ বিশ্বাস হলো মনোজাগতিক ও পূর্ব ধারণামূলক দর্শন। তবে রাজনৈতিক আচরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিমাপের আপাত সুরাহা করা সম্ভব। বস্তুত মানুষের রাজনৈতিক আচরণে যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুসৃত রীতি-নীতিগুলো স্থান পায়, তাহলে ধরে নেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বর্তমান। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুসৃত রীতি-নীতিগুলোকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। Robert Dahl বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বিভিন্ন শর্ত ও রীতি-নীতির প্রতি নাগরিকদেরকে আনুগত্য পোষণ করতে হয়, সেসব শর্তকে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বলে অভিহিত করা হয়। এসব শর্তের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা অর্থাৎ নির্বাচন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনের শাসন. স্বাধীনতা ও সাম্য ইত্যাদি। নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শর্ত। বলা চলে, আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ হচ্ছে নির্বাচন। গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে নির্বাচনই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রকে যদি পদ্ধতিগত (procedural) দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের একমাত্র উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। হান্টিংটন মন্তব্য করেছেন, "নির্বাচন গণতন্ত্রের জীবনই কেবল নয়, বরং তা স্বৈরতন্ত্রের মৃত্যুও" (Elections are not only the life of democracy. They are also the death of dictatorship)।

৭. নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা

এটি বলতে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কতটুকু সচেতন এবং তারা তা পালন করে কি-না, তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন নাগরিক জ্ঞানসমৃদ্ধ (civic sense) সচেতন নাগরিকগোষ্ঠী। বর্তমান প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে যদিও নাগরিকদের সরাসরি শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের

সুযোগ সীমিত, তথাপি নাগরিক কথাটির সঙ্গে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের সচেতনতা, সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব। একজন নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের নিকট থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও তাকে পালন করতে হয়। নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে একপ্রকার দায়িত্বশীলতা (obligation)। A. C. Kapur মন্তব্য করেছেন যে, যখন একজন নাগরিক দায়িত্বশীলতার অধীনে আসে তখনই তার প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জ্ঞান বা সচেতনতার বিকাশ ঘটে। Almond and Verba সুনাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, একজন নাগরিক তখনই সুনাগরিক যখন সে তার obligation সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকবে এবং তা পালনের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। তাঁদের মতে, একজন ব্যক্তি যদি কাঠমিস্ত্রি হয় তাহলে যেমন তার ভালো মিস্ত্রি হওয়া উচিৎ তেমনি একজন নাগরিক যদি সুনাগরিক হয় তাহলে তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে এবং তা পালনের জন্য নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একজন নাগরিক তখনই সুনাগরিক হবে যখন সে তার দায়িত্ব পালন করবে। নাগরিক জ্ঞান বা নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বলাবাহুল্য গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ কখনই সম্ভব নয় যদি না নাগরিকদের মধ্যে civic sense এর বিকাশ ঘটে।

৮. রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন

সচেতনতা ও মূল্যায়ন বলতে সরকার ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং সরকার ও বিরোধী দলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নীতির সমালোচনামূলক মূল্যায়নে ব্যক্তির সক্ষমতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। রাষ্ট্র কিংবা সরকারি নীতি-প্রক্রিয়ার প্রতি সজাগ থাকা এবং এসব প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে সাধিত হয় তা যখন নাগরিকদের অবগতির মধ্যে থাকে তখনই বলা যায় ঐ রাষ্ট্র বা জনপদের নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা আছে, যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম শর্তও বটে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয় বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের পেছনে মূল প্রেরণা ছিল গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে শোষণ থাকবে না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে এবং সর্বোপরি প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে তুলবে। নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ ও সহনশীলতার

পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলো বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, অথচ অদ্যাবধি রাজনৈতিক কাঠামোতে গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোতে বিশেষ করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানগুলো কতটুকু বিকাশিত হয়েছে তা আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির তাত্ত্বিক উপাদানগুলো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করলে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের উপাদানগুলো এখনও পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়নি। উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসৃত নীতিগুলোকে কার্যকর করা এবং সরকারকে দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমনকি সাধারণ জনগণের মধ্যেও বিরোধী দল বা মতকে সহ্য করার মানসিকতা গড়ে উঠেনি। অধিকন্তু বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামতেরই প্রতিফলন ঘটে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এদের অবদান যথেষ্ট। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে জাতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগণ যদি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে তাহলে এদেশে গণতন্ত্র সফলতা অর্জন করতে পারে। কারণ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য গণতন্ত্রের সহায়ক সংস্কৃতি দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিদ্যমান নেই।

উপসংহার

একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুসারেই সাধারণত সে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোসমূহ ও ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতি ও কাঠামোর মধ্যে নিবিড় ইতিবাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ তাদের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপস্থিতি। গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না। শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এক্ষেত্রে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করে মাত্র। সুতরাং সেই নির্বাচকমণ্ডলী তথা সাধারণ জনগণের মধ্যে এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বা

চেতনার বহিঃপ্রকাশ খুব একটা দেখা যায় না। আমরা যদি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলো যেমন সহনশীলতা; পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বোধ; সহযোগিতার মনোভাব; সমঝোতা ও ঐকমত্য; রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন; গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা; এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়কে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিবেচনায় আনি, তাহলে দেখা যাবে যে, এর কোনো উপাদানই পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে বিকশিত হয়নি। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

সুতরাং বাংলাদেশে গণতন্ত্র নির্মাণের বিষয়টি নির্ভর করবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চা ও পরিমিতি বোধের উপর।

References:

1. Huntington, S. P., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahama Press, 1991. p. 16.
2. Diamond, "Introduction: Persistence, Erosion, Breakdown and Renewal", in Diamond, Linz and Lipset (eds), *Democracy in Asia,* Vistaar Publication, 1989, p. 10.
3. মাসুম, আব্দুল লতিফ,"বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির ভাষা : একটি বিশ্লেষণ", *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যা ৫, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ২০০০।
4. Lipset , Seymour Martin, *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. III, Routledge, London, 1995, p. 966.
5. Brient, Michael, *A Genealogy of Political Culture*, Westview Press, 1991, p. 4.
6. Black, James A. and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research,* John, Wiley and Sons, NY, 1976, p.109.
7. Almond G.A. and Sidney Verba, *The Civic Culture*, Princeton, NJ, 1972, pp. 6-35.
8. Baechler, Jean, *Democracy: An Analytical Survey*, UNESCO Publishing, 1995, pp. 127-134.
9. Honderich Ted (ed), *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford University Press, 1995, p. 877.
10. *Dictionary of Politics*, Penguin Books, London, 1986, p. 243.
11. Lipset, S. M., "Reflection on Capitalism, Socialism & Democracy," Journal of *Democracy* , Vol. 4, No.-2, April 1993, pp. 47-50.
12. Diamond. Larry, "Three Paradoxes of Democracy." Journel of Democracy, Vol. 1, No-3, Summer 1993, pp.48-49.
13. Quoted in Hasanuzzaman, Al Masud, Role of Opposition in Bangladesh Politics, UPL, 1998, p. 8.
14. Barker, Ernest, *Reflection on Government*, Oxford University Press, 1942-1967, London, pp. 202-203.

15. Curtis, Michael, *Comparative Government & Politics*, 2nd ed, Harper & Row Publishers, New York, 1978, p. 212.

16. Sills, L.David (ed), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company, Vol. 3, p. 384.

17. Diamond, Larry, "Three Paradoxes of Democracy" in The Journal of Democracy, Vol. 1, No. 3 Summer 1993, pp. 56-57.

18. উদ্ধৃতি সংগৃহীত জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮।

19. Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*, Vol. 1, Cambridge University Press, 1976, pp, 15-16.

20. Held, David, *Models of Democracy*, Polity Press, 1987, p. 194.

21. Ball, Alan R., *Modern Politics and Government*, The Macmillan Press Ltd, 1977, p p. 52-60

22. Persons, Talcott and Edward A. Shills, *Toward a General Theory of Action,* Cambridge, Mass, 1951, p. 53.

23. Almond & Powell, *Comparative Politics: A Development Approach*, Oxford and IBH Publishing Co. 1966, p. 66.

24. Dahl, Robert A., *Polyarchy and Opposition*, New Haven, CT : Yale University Press, 1971, pp. 3-20.

25. Verba, Sidney, Norman H. Nie and Jae-on-Kim, *Political Participation and Political Equality ; A Seven Nation Comparison*, Cambridge University Press, 1978, pp. 46-47.

26. Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Union Paperbacks, 1987, p. 269.

27. আলম, মো: শামছুল, "রাজনীতি ও হরতাল: বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, ১৯৯১, পৃ. ১।

28. Kapur, A.C., *Principles of Political Science*, S. Chand & Company Ltd, New Delhi,1992, p. 227.

29. আলী, সৈয়দ মকসুদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬৯.

30. Lipset, S. M., *Political Man*, Arnold Heinemann India, New Delhi, 1973. p. 212.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, 1973 — একটি পর্যালোচনা

মুঃ আবদুল হাকিম*

Abstract

Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, 1973 is a fundamental report in shaping the very structure of civil service in Bangladesh. This report is very significant on many grounds. The review of this kind of report not only will reveal some basic information and knowledge of civil service but also will sharpen our insight and intellectual quality. Moreover this sort of practice is very much essential to restructure our civil service on solid footing. This is an endeavor of indepth analysis of various aspects of administrative reforms along with the status of implementation. Some points of this review have been translated in my own Bengali language to make it vivid and understandable.The report has put more emphasis on specialization in civil service according to the spirit of Fulton Report (1968). It is evident from the tone of the report that committee has a bias for the socialistic pattern of civil administration contemporaneous with the trend of time and politics.

প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতীত জনবান্ধব প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। আবার জনবান্ধব বা নাগরিকবান্ধব প্রশাসন ছাড়াও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। সারা পৃথিবী বর্তমানে একটা গ্লোবাল ভিলেজের মতো। ফলে পৃথিবীর কোনো দেশ এখন আর একা চলতে পারে না। বস্তুত শোষণ, দুর্নীতি এবং দারিদ্র মুক্ত একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন করা সুশাসনের মূল লক্ষ্য– যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের আয় ও ব্যয় চিত্র স্বচ্ছভাবে প্রদর্শিত হতে হবে; যেখানে স্বল্পতম সময়ে ন্যায্য সেবা এবং ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে; থাকবে স্বাভাবিক জন্ম ও মৃত্যুর গ্যারান্টি; যেখানে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিক যোগ্যতানুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাবে। নাগরিক জীবন হবে দুশ্চিন্তামুক্ত, সুস্থ, উৎকণ্ঠারহিত, রোগ ও দুর্ভোগমুক্ত; যেখানে অল্প কিছু মানুষ বিপুল অর্থ-বিত্ত-সম্পদের লোভে সব কিছু লুটে-পুটে খেতে গিয়ে নাগরিক জীবনকে নারকীয় করে তুলবে না। স্মর্তব্য, সুশাসন আকাশ-কুসুম কোনো কল্পনা বা বিষয় নয়। সুশাসনের বিভিন্ন নমুনা গ্লোবাল ভিলেজ থেকে পাওয়া সম্ভব। তবে জনবান্ধব প্রশাসনের ফর্মুলাটা হতে হবে অবশ্যই বাংলাদেশের নিজস্ব।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। বর্তমানে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় পরিচালক পদে কর্মরত।

আমরা জানি, আর কয়েকটা বছর পার হলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে এবং সেজন্য ঘটা করে পূর্তি-উৎসব পালন করা হবে। এসময় বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক পঞ্চাশ বছরের জাবেদাখাতা নিয়ে ডেবিট-ক্রেডিট মিলাতে ব্যস্ত হবে। কী পেল- না পেল এবং কেন পেল না- অবশ্যই তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। এখানে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, পঞ্চাশ বছর একটা জাতির জীবনে খুব বড় একটা সময় নয়। বরং তা যদি বলা হয়, তবে তা হবে প্রকৃত দায়িত্ব এড়ানো এবং স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মত্যাগকে খাটো করে দেখা।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধির জন্য তথা প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ যাবৎ প্রণীত সকল রিপোর্ট এবং সেগুলোর সম্পূর্ণ (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন কখনই হয়নি) বা আংশিক বাস্তবায়ন নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। বস্তুত রিপোর্টগুলো কেন বাস্তবায়িত হলো না–সেটাও এই পর্যালোচনায় আসা উচিৎ। এতে করে প্রশাসনিক সংস্কারের গতিধারার সঙ্গে জনগণ সম্পৃক্ত হতে পারবে। কেননা সংস্কার জনগণের ভাগ্য বদলের জন্য খুবই দরকার।

যাই হোক, আমাদের বর্তমান নিবন্ধে আমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সনের ১৫ই মার্চ তারিখে গঠিত প্রথম প্রশাসনিক সংস্কারবিষয়ক কমিটি, যেটি মূলত কমিটি-প্রধান তথা সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর 'অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহ্মেদ চৌধুরী কমিটি' নামে পরিচিত–এটি নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় আলোচনার চেষ্টা করব। এ কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন–প্লানিং কমিশনের তৎকালীন সদস্য অধ্যাপক জনাব আনিসুর রহমান এবং তৎকালীন এম.সি.এ. (মেম্বার অভ কনস্টিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী) জনাব আব্দুল মুন্তাকীম চৌধুরী। অন্যদিকে কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে সার্বিক সহযোগিতাপ্রদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্বপালন করেছিলেন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মহবুবুজ্জামান।

আগেই জানিয়ে রাখি, এসংক্রান্ত অধিকাংশ রিপোর্টের মতো এই কমিটির রিপোর্টটিও প্রণীত হয়েছিল ইংরেজিতে। এর প্রথম খণ্ডে চাকরির পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে।

এখানে কমিটির প্রতিবেদনের বিষয়ে বলবার আগে প্রসঙ্গত কমিটি-প্রধান জনাব মুজাফ্ফর আহ্মেদ চৌধুরী (নামটি তিনি 'চৌধুরী মুজাফ্ফর আহ্মেদ' রূপেও লিখেছেন) সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা যেতে পারে। একদা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং ভাইস-চ্যান্সেলর-ই শুধু ছিলেন না, বলা যেতে পারে এই তিনি প্রশাসনিক সংস্কারবিষয়ক একজন তাত্ত্বিক-পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞও ছিলেন। প্রসঙ্গত লন্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য তিনি যে থিসিস দাখিল করেছিলেন এবং পরে তা পানও, সেটির নাম থেকেই বোঝা যাবে তাঁর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ক্ষেত্রটি; থিসিসটির নাম–The Civil Service in Pakistan. তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের অন্যতম থিংক ট্যাংক। অন্যতম এক্সপার্ট হিসেবে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৬-দফার পক্ষে রাওয়ালপিন্ডির রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সেও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত প্রভিন্সিয়াল অটোনমির রূপরেখা এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারের রূপরেখা কী হবে–তা পরবর্তীকালে প্রণীত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে (একটি খণ্ডে) বিধৃত আছে। এককথায় বলতে পারি, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের পথিকৃৎ।

যাই হোক, তাঁর কমিটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পে কমিশন হিসেবে কাজ করে। তাঁর রিপোর্টটিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। কিন্তু এ রিপোর্টটি নানা কারণে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, তা বলাইবাহুল্য। বিশেষ করে তৎকালীন প্রশাসনের উপর মহলের অনেকের নিকট এটি বিশেষ মনঃপূত হয়নি। তাছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর পরবর্তীকালে কেউ আর এটির ব্যাপারে তেমন উৎসাহও দেখাননি। কাজেই বলা চলে, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই রয়ে গেছে এটি। তবে এটাও ঠিক, মূলত সময়ের অভাবে সমাজবিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয় রিপোর্টে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি। হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল না। অন্যদিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন কমিটি প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেনি। কমিটি তাদের ডকট্রিনকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। যদিও এটাও ঠিক যে, যথেষ্ট সময়াভাবে সমাজের অনেক স্টেকহোল্ডারের মতামত রিপোর্ট প্রণয়নকালে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যকথায় জনপ্রত্যাশার পর্যাপ্ত সার্ভে করা হয়নি। জনগণ কেমন প্রশাসন দেখতে চায়–ব্যাপকভাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। তাছাড়া এজাতীয় রিপোর্ট প্রণয়নকালে জনমনস্তত্ত্বকে নির্মোহদৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, সেটিও হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ এধরনের একটি রিপোর্ট প্রণয়নকালে প্রশাসনে যারা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, তাদের তিক্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেও এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়ার আবশ্যকতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা এই জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যমান সিস্টেম ডিজঅর্ডার হওয়ার কারণগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে কমিটি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মোড়ল সোভিয়েত রাশিয়াকে রোল মডেল ধরে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তৎকালে এবং এখনও রাশিয়া সুশাসনের জন্য কোনো রোল মডেলের মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তখন রাশিয়া ছিল অদ্বিতীয়। সেসময় চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,

মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর আজকের মতো এতটা উন্নত ছিল না এবং প্রতিপক্ষে পশ্চিমা দেশগুলো ছিল ধনতন্ত্রের প্রতীক। তখন দক্ষিণ- দক্ষিণ সহযোগিতা এবং বাজার অর্থনীতির এত প্রচার বা প্রসার ছিল না। তাই কমিটি এশিয়ার উন্নত দেশসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশভ্রমণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বর্তমানে বিশ্ব প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, রিপোর্টিতে দেশপ্রেম, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সদিচ্ছার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। এজন্য রিপোর্টটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

মূলত সরকারি চাকুরিতে নবনিয়োগ পলিসি নির্ধারণের জন্য উক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কমিটির কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করা হয়। নানা কারণে কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য এটাই প্রথম কমিটি ছিল। দ্বিতীয়ত কমিটি বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে গড়া। জনাব আব্দুল মুন্তাকীমকে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই মনোনয়ন দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত কমিটিতে অ্যাকাডেমিকদের প্রাধান্য ছিল। চতুর্থত কমিটিতে আমলা ছিলেন মাত্র একজন। পঞ্চমত কমিটিতে প্ল্যানিং কমিশনেরও একজন প্রতিনিধি ছিল।

কমিটির সম্প্রসারিত কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

ক. কারিগরি এবং সাধারণ চাকরির গঠন কাঠামো পর্যালোচনা করে কাজের স্বার্থে এবং সরকারের প্রয়োজনের নিরিখে চাকরির ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ণয় করা।

খ. সিভিল সার্ভিসকে একীভূত করা (ডিফেন্স সার্ভিসসমূহ ব্যতিরেকে)।

গ. নতুন কাঠামোতে বিভিন্ন চাকরির জনবলকে সম্পৃক্ত ও সমন্বয় করার নীতিমালা প্রণয়ন এবং তাদের জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা প্রস্তুত করা। উল্লেখ্য, যদি চাকরির গঠনগত কোনো পরিবর্তন আনা হয় তাহলে জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রাখা।

ঘ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মের চাহিদার নিরিখে সরকারি চাকুরিতে ভবিষ্যৎ রিক্রুটমেন্ট পলিসি নির্ধারণ করা।

ঙ. প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করা এবং তার জন্য সুপারিশ পেশ করা।

দায়িত্ব পালনকালে কমিটি ১৮৩টি সার্ভিস সমিতির বক্তব্য শুনেছিল। ১৩জন মন্ত্রীর সঙ্গে এবং ৫৫জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন যেমন–সরকারের সচিববৃন্দ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ,

সরকারি নীতিমালাধীন সেক্টর কর্পোরেশনের প্রধানগণ, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। কমিটির সদস্যবৃন্দ চট্টগ্রাম ও রাজশাহী পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারের আমন্ত্রণে কমিটি রাশিয়াও ভ্রমণ করে। সেখানকার প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য জাতীয় বেতন কমিশনের সঙ্গে কয়েকটি যৌথ সভার আয়োজন করা হয়। সেসব সভার একটিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে সভাপতিত্ব করেন।

যাই হোক, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে কমিটি লক্ষ করে যে, বিভিন্ন ধরন ও স্তরের চাকরিজীবীদের মধ্যে একটি কৃত্রিম দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। চাকরিজীবীদের মধ্যে পদোন্নতিজনিত বৈষম্য ও পেশাদারিত্বের অভাব আছে। চাকরিগুলো বিভিন্ন শ্রেণি ও পদমর্যাদায় বিভক্ত। তবে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বস্তুত প্রচলিত চাকরি কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে, যা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক গণ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। সুতরাং এজাতীয় প্রশাসনযন্ত্র দিয়ে দ্রুত উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্পন্ন হচ্ছিল না। এপরিস্থিতিতে কমিটি চাকুরি কাঠামোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কমিটি এ কারণে সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি শ্রেণিহীন সমন্বিত গ্রেড কাঠামোর চিন্তা করেছিল, যেখানে কারো জন্য কোনো পদ রিজার্ভ বা সংরক্ষিত রাখার নিয়ম থাকবে না। অনিবার্য কারিগরি প্রয়োজন ব্যতিরেকে সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ তাদের নির্বাচিত গ্রেডে থেকে উপযুক্ত পেশাদারিত্ব অর্জন নিশ্চিত করবে; সেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মেধাবীদের জন্যদ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, জ্যেষ্ঠতা এবং কর্মতৎপরতাকে বিবেচনায় নেয়ার সুপারিশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করার পরামর্শও দেওয়া হয়। এছাড়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এসএসবি গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

কমিটি তৎকালীন চাকরি কাঠামোকে পুরোনো এবং সেকেলে অভিহিত করে। কেননা সেটা ছিল জনগণের প্রতি অ-দায়বদ্ধ বা অসংবেদনশীল ও ঢিলেঢালা প্রকৃতির। সেজন্য কমিটি এমন একটি চাকরি কাঠামোর জন্য সুপারিশ করেছিল যেখানে যুক্তিসঙ্গত কর্মবণ্টন হবে। দ্রুত কর্ম সম্পাদনের একটা বিল্ট ইন মেকানিজম থাকবে। সেই প্রশাসন জনগণের প্রতি সংবেদনশীল থাকবে। চাকুরি পূনর্গঠন জাতীয় বেতন কমিশনের বেতন নির্ধারণকে সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি আশা প্রকাশ করে যে, প্রস্তাবগুলো সরকার পুরোপুরিভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করবে, তা না হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না এবং নতুন নতুন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হবে।

রিপোর্টটির প্রথম অধ্যায়ে সিভিল সার্ভিসের কর্মসম্পাদন সম্পর্কে আলোকপাত করা

হয়েছে। তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে কাজগুলো করা দরকার তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন–প্রকিউরমেন্ট, খাদ্য বিতরণ, শরণার্থী পুনর্বাসন, গৃহায়ন, যাতায়াত, শিল্পকারখানায় পর্যাপ্ত উৎপাদন, শিল্প কারখানাগুলোর পুনর্গঠন, উৎপাদন, বিধ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন, আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ব্যাংকিং খাতকে সুবিন্যস্ত করা, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলোকে সমন্বিত করা, প্রশাসনকে পুনর্গঠন করা, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি কাজের জন্য যুগোপযোগী প্রশাসন গঠন করা কমিটির উদ্দেশ্যে ছিল বলে আলোচ্য রিপোর্টে মতামত ব্যক্ত করা হয়। স্মর্তব্য, তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের মতাদর্শ ছিল গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। এজন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় বড় প্রকল্প গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল। আমরা জানি, তৎকালীন সরকার সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করতে গিয়ে বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো ক্রমশ জাতীয়করণ করছিল/করেছিল। সে সকল কারখানার ব্যবস্থাপনা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়-অভিজ্ঞ আমলা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত করার প্রয়োজন ছিল। আর এজাতীয় ব্যবস্থাপনার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের আবশ্যকতা ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে। ক্রমাগত গবেষণা ছাড়া যুগোপযোগী প্রশাসন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিবেদনটিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছিল।

"Besides these and other specializations like economics, political science, public administration and the social sciences have also an immense bearing on government decisions and policies." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Srvices, 1973, p. 2)

বলাবাহুল্য রিপোর্ট প্রণেতৃগণের প্রশাসনে অর্থনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ছিল। তাঁদের ভাষ্যঃ "In the field of economics many civil servants require a thorough knowledge of economic process. The management of the nationalized sectors of the economy which will be in a state of continuous expansion calls for a thorough knowledge of this sector of economy on the part of civil servants. The country needs industrial administrators and managers of the right and high caliber." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 2)

রিপোর্ট প্রণেতাগণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কাজ করার উপযোগী একটি প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করার অভিপ্রায়ে রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে: "Moreover the top civil servants are the confidential advisers of the Ministers who alone shall be answerable to the Parliament for policy." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 3)

তাঁরা নিছক কোনো Regulatory প্রশাসন গড়ে তুলতে চাননি। তাঁদের মতে– "It is directly involved in the formulation of policies and implementation of tasks relating to social welfare and economic growth." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 3)

তাঁরা সাধারণ ও উন্নয়ন প্রশাসনের রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ প্রশাসনিক কাজ বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন–বিচার প্রশাসন, আইনশৃংখলা রক্ষা, অর্থ, রাজস্ব ও আয়কর সংগ্রহ, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, ভূমিব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রচার ও জন-তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। উন্নয়নপ্রশাসন বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন– দৈনন্দিন সেবা সরবরাহ, যাতায়াত ও পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ঋণ ও বীমা, বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প, মৌলিক শিল্প, কৃষি, সমবায়, শিক্ষা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি।

তাঁদের মতে, প্রশাসনের মূল কাজ হবে বিরাজমান সমস্যাগুলোর চমৎকার সমাধান খুঁজে বের করা। সমস্যাগুলো হতে পারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত। রিপোর্টের ভাষায়: "Meet the political, economic, social, scientific and technological problems of today. They should be attuned to the hopes and aspirations of the country and the people and should be ready to grasp new ideas from abroad and make their correct evaluation." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 4)

দশ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক কাজের একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা: "In carrying out the responsibilities, the civil servants are expected to create a kind of living fellowship with the common men and a firm dedication to democracy and socialism."

(Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 4)

বস্তুত কমিটির সদস্যদের এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, তাঁরা গতানুগতিক এবং আত্মম্ভরী প্রশাসন গড়ার ঘোরবিরোধী ছিলেন। বরং একটি সুবিধাবাদী প্রশাসনের পরিবর্তে একটি সেবামুখী প্রশাসন গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ মর্মে তাঁদের একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাও ছিল। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বীজবপন এবং ফসল তোলার মৌসুমের কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে তারা কৃষকের সঙ্গে মাঠে হাতে-নাতে কাজ করবে–যেমনটি আমরা দেখতে পাই *শাইখ সিরাজের "হৃদয়ে মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানে*। অনুরূপভাবে জাতিগঠনমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ সুবিধাজনক সময়ে প্রশিক্ষণের সঙ্গে মাঠে হাতে-নাতে কাজ করবে। এতে করে তাদের কর্মের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি হবে, ফলত এটি একটি উন্নত জাতি গঠনে বীজমন্ত্রের মতো কাজ করবে। আমলা হচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রমিক। প্রকৃত কৃষক-শ্রমিক বা মেহনতি মানুষের সঙ্গে আমলাদের হৃদ্যতা সমাজের চেহারা বদলে দিতে পারে। অথচ এতে আমলাতন্ত্র গণবিচ্ছিন্ন হবে না এবং আমলাতন্ত্রের একটি কোটারি রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটে অংশ নিতে পারবে না। উপরন্তু এ জাতীয় কাজে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আমলাদের বাস্তব দেশ গঠনমূলক কাজের তথা দেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটার সম্ভাবনাও প্রচুর।

সঙ্গত কারণে আলোচ্য রিপোর্টে আইসিটির উল্লেখ নেই। কেননা আজকের মতো সেসময় আইসিটির তেমন বিকাশ ঘটেনি। বর্তমানে আইসিটি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আইসিটিতে একটি ন্যূনতম যোগ্যতা এখন সিভিল সার্ভিসে বাধ্যতামূলক করার সময় এসেছে। আলাদা আইসিটি এক্সপার্ট না রেখে প্রত্যেক সিভিল সার্ভেন্টকে এখন আইসিটি এক্সপার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; তা না হলে ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন পদে-পদে বাধাগ্রস্ত হবে। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সেবাধর্মী প্রশাসন গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিপুল গতি লাভ করতে সক্ষম হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মনে রাখতে হবে, কমিটি নতুন একীভূত সার্ভিস হিসেবে বিসিএস বা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রস্তাব পেশ করেছিল, যা ইতিমধ্যে অনেকখানি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদের প্রস্তাব ছিল, যে সকল কাজের প্রকৃতি একই রকম কিংবা একই ধরনের যোগ্যতা যে সকল সেবা বা কাজে প্রয়োজন হয়, অথবা যে সকল কাজে ঝুঁকির ধরন একই রকম–সেগুলো একটি গ্রেডভুক্ত হবে। আর এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে সতর্ক জব অ্যানালিসিস করার কথা তাঁরা বলেছিলেন:

ক. কাজের শেষ ফলাফল এবং বাস্তবায়নযোগ্য বিশেষ লক্ষ্যসমূহ;

খ. কাজের গুরুত্ব;

গ. ফলাফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্ম-অভিজ্ঞতা;

ঘ. কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের সংযোগ ও

ঙ. কাজের প্রকৃতি ও উপযুক্ততা তথা প্রয়োজনীয়তা।

কমিটি সিভিল সার্ভিসের জন্য দশটি গ্রেড নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল। এই দশটি গ্রেড নির্বাচন করা হয়েছিল সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান অর্থাৎ সিএসপি, পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান বা পিএসপি, সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস, তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস, জেনারেল সার্ভিস এবং টেকনিক্যাল সার্ভিসকে ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ রকম: "The civil servants have dual functions. They have to provide expert service to the Ministers on laws and policy decisions and at the same time, execute those laws and policy decisions." (Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 30)

কমিটির প্রস্তাবিত দশটি গ্রেড ছিল নিম্নরূপ:

i. Senior Administrative/Top Specialist Grade
ii. Administrative/Chief Executive Grade
iii. Junior Administrative/Higher Executive /Higher Professional Grade
iv. Senior Executive/Senior Professional Grade
v. Junior Executive/Junior Professional Grade
vi. Lower Executive/Lower Professional Grade
vii. Lower Supervisory/Higher Ministerial/Higher Technical Grade
viii. Lower Ministerial/Lower Technical Grade
ix. Sub-Ministerial/Sub-Technical Grade (Semi-skilled Staff)
x. Sub-Ministerial/Sub-Technical Grade (Unskilled Staff)

(See, Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, p. 30,31)

উল্লেখ্য, আলোচ্য রিপোর্টটির Appendix-1-তে যে সমস্ত পদ উচ্চ গ্রেডভুক্ত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেখানো হয়েছে। তবে বেতন স্কেলের গ্রেডের সঙ্গে উক্ত গ্রেডগুলোর অভিন্নতা থাকবে না।

কমিটি দশম গ্রেডে অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সুপারিশ করেছিল। একটু উচ্চতর স্কেলে বেতন দিয়ে কমিটি পদটি আপগ্রেড করার পক্ষপাতী ছিল। সেক্ষেত্রে পদটির নাম Messenger বা তথ্যবাহক বা পত্রবাহক করার পক্ষে মত পেশ করেছিল। প্রসঙ্গত রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, এসময় অষ্টম ও নবম গ্রেডে মোট তিন লক্ষ কর্মচারী ছিল। কমিটি পরিকল্পিত উপায়ে দীর্ঘমেয়াদি ছক তৈরি করে এই সংখ্যা এক লাখে নামিয়ে আনার সুপারিশ করে। রিপোর্টের ২য় খণ্ডে কমিটি টাইপিস্ট/স্টেনো টাইপিস্ট এবং স্টেনোগ্রাফার পদগুলোতে পুলভিত্তিতে কাজ করানোর পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এ জাতীয় পদগুলোর এক চতুর্থাংশ অফিসারদের দিয়ে পূরণ করার অনুকূলেও মত প্রদান করে। এতে করে সরকারি কাজে গতি সঞ্চার হবে বলে তাঁদের অভিমত। এর ফলে অফিসারদের সংখ্যা বাড়বে এবং অফিসার ও জনগণের অনুপাতও যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। সে সময় এক্ষেত্রে একটা গ্যাপ বিদ্যমান ছিল। অফিস কাজে মন্থরতার তাও একটা অন্যতম কারণ ছিল।

কমিটি অফিসারদের ব্যক্তিগত স্টাফ না রাখার পক্ষেও মত ব্যক্ত করেছিল। কেননা এটা ঔপনিবেশিক ব্যাপার। রাখাটা অপরিহার্য হলে ভিন্ন নামে রাখার পক্ষে মত দেয়া হয়। কমিটি তথ্য বাহকদের প্রতি মাসে পরিবর্তনের পক্ষে মত ব্যক্ত করে।

Superior-Subordinate Relationship স্থাপিত হবে স্কেলার প্রসেসভিত্তিক। কাজ এবং বেতন বিবেচনা করে গ্রেড নির্ধারণ করতে হবে। চেইন অব কমান্ড হবে অনেকটা পিরামিডের মতো। মিড লেভেলে বেশি কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকলে সরকারি কাজের গতিবেগ বাড়বে বলে কমিটি মনে করেছিল। তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে–এটাও তাঁদের মত।

সিভিল সার্ভিসে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করতে হলে পদগুলোকে দুইভাগে ভাগ করতে হবে বলে কমিটি মনে করেছিল। এগুলোর একটি হবে Functional Posts এবং অন্যটি Area Group Posts.

ফাংশনাল পদ (Functional Posts)

এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্তির জন্য টেকনিকেল ডিগ্রী জরুরি। টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকলেও এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। প্রকৌশলী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, স্থপতি, টেকনিশিয়ান, মেকানিক, নকশাবিদ, হিসাবরক্ষক, ইনকাম ট্যাক্স কর্মকর্তা, আইনজীবী প্রভৃতি পেশাজীবীরা এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। যেমন–

(১) ইনকাম ট্যাক্স কর্মকর্তা;
(২) রাজস্ব বোর্ডের সদস্য;
(৩) অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল ইত্যাদি;
(৪) অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর (কাস্টমস) ইত্যাদি;
(৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, সিভিল সার্জন ইত্যাদি;
(৬) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি;
(৭) কৃষি, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ;
(৮) ডিপ্লোম্যাটিক পদসমূহ;
(৯) এসপি, ডিআইজি, আইজি ইত্যাদি;
(১০) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ;
(১১) জুডিশিয়াল কর্মকর্তাগণ।

এরিয়া পদসমূহ (Area Group Posts)

এসব পদে পদায়নের জন্য কোনো বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। নিম্নলিখিত বিভিন্ন গ্রুপে এদের পদায়ন করা যেতে পারে বলে কমিটি মনে করেছিল:

(1) Economic Administration;
(2) Financial Administration;
(3) Industrial Administration;
(4) Commercial Administration;
(5) Social Administration;
(6) Education Administration;
(7) Personnel Administration;
(8) General Administration.

(Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part 1 : The Services, 1973, pp. 35-6)

বর্ণিত ৮টি Cluster-এ এরিয়া গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের পদায়ন সীমাবদ্ধ থাকবে।

ফাংশনাল গ্রুপের বাইরের কর্মকর্তাদের যে কোনো একটি এরিয়া গ্রুপে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টে এবং সে অনুযায়ী তাদের পদায়নের সিদ্ধান্ত

নেয়ার কথা বলা হয়েছিল। স্মর্তব্য, একটি এরিয়া গ্রুপ অর্থ কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় নয়। কার্যত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের বদলির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ফাংশনাল গ্রুপের কর্মকর্তাগণের সচিবালয়ে তাদের ফাংশনাল এরিয়াতে পদায়ন হতে পারে। তবে উল্লিখিত এরিয়া গ্রুপগুলোতে নয়। এব্যাপারে সংস্থাপন/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটি পদায়ন ও বদলি নীতিমালার আওতায় তা করবে বলে কমিটি মত প্রকাশ করে। তবে এ নীতিমালা কার্যকর করার সুপারিশ করা হয় পঞ্চম গ্রেড থেকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে একীভূত সার্ভিসের ব্যবস্থাপনার জন্য কমিটি নতুন পার্সোনেল ডিভিশন সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিল, যা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। সকল সার্ভিসের ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্টের আল্টিমেট অথরিটি থাকবে এই ডিভিশনের হাতে। কমিটি প্রতি মন্ত্রণালয়ে একটি করে পার্সোনেল সেল খোলারও পরামর্শ প্রদান করে, যার সঙ্গে এ ডিভিশনের লিঙ্ক থাকবে। কমিটি পার্সোনেল ডিভিশনের অধীনে প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগে একটি করে প্রশিক্ষণ সেল খোলার পরামর্শ দিয়েছিল। বলাবাহুল্য এসব সুপারিশ ১৯৭৩ সনের। বর্তমানে অনেক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ সংস্থাপন/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিদ্যমান এপিডি অনুবিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এটিকে আপগ্রেড করে বিভাগে উন্নীত করা যায়। গুরুত্ব বিবেচনায় এর নতুন নাম দেওয়া যায়– Strategic Human Resource Management Division (SHRMD)। বর্তমানে প্রশিক্ষণের আধুনিক নাম Human Resource Development Division (HRDD)। কাজেই গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং অনুবিভাগকে আপগ্রেড করে এর নাম দেওয়া যায়– Human Resource Development Division (HRDD)। অনুরূপভাবে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগকে আপগ্রেড করে এর নাম রাখা যায় Change Management Division (CMD), যার কাজ হবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করা।

প্রসঙ্গত ইউরোপের বহু দেশে সিভিল সার্ভেন্টগণকে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন থাইল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস লেবার ইউনিয়ন আছে। কোটারি থেকে আমলাতন্ত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সিভিল সার্ভিস কমিশন এবং সাব-কমিশনে তাদের প্রতিনিধিত্ব আছে। প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয় অফিসারদের নির্বাচনের মাধ্যমে। থাইল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস কমিশনের প্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রী। আবার সিভিল সার্ভিস সাব-কমিশনের সভাপতি মন্ত্রী। ফলে যে কোনো প্রশাসনিক সংস্কারে রাজনৈতিক অনুমোদন পেতে সেখানে কাউকে বেগ পেতে হয় না।

যাই হোক, পরিশেষে আমাদের পর্যালোচ্য কমিটি-প্রধান অধ্যাপক জনাব চৌধুরী মুজাফ্ফর আহ্মেদ-এর পূর্বোক্ত The Civil Service in Pakistan গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে Staff Relation in the Civil Service in Britain and Pakistan

শিরোনামভুক্ত অংশে সিভিল সার্ভেন্টদের ট্রেড ইউনিয়ন করার বিষয়ে যে অগ্রসর চিন্তার ছাপ রেখেছিলেন, যা বলাবাহুল্য গ্রন্থটি প্রকাশের আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও প্রাসঙ্গিক ও চিন্তার উদ্রেক সৃষ্টিকারী, তার কিছু অংশ উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করব।

"There is considerable substance in the words of Professor Stahl when he says, "The progressive administrator will find employee organizations of value not only as the instruments for the collective presentation and settlement of grievances, but also as the channels of communication with the staff, as important factor in building moral, and as instruments for energizing the creative potentialities of the employees. Moreover such an association is a necessary preliminary to the democratization of the administrative process./...In England, the civil service staff associations may be registered as trade unions. In Britain and elsewhere the civil servants enjoy the right to strike."(Chaudhuri Muzaffar Ahmed, The Civil Service in Pakistan, NIPA, Dacca, 1969, pp. 353-55)

উপসংহারে বলা যায় যে, জনপ্রশাসন হলো নাগরিক সেবাদানের প্রথম কেন্দ্র এবং বিচারবিভাগ হলো তার দ্বিতীয় কেন্দ্র। নাগরিক সেবার সূচনা প্রথম কেন্দ্রে এবং দ্বিতীয় কেন্দ্রে সেটি চরম আকার ধারণ করে। এজন্য লক্ষ লক্ষ মামলার স্তূপ জমা হয় আদালতে। জনগণ হয় মামলাবন্দি। প্রথম কেন্দ্র থেকে জনগণ চায় সেবা এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র থেকে বিচার। এ সেবা ও বিচার জনগণ ঠিক ঠিক পাচ্ছে কি-না, তা মাঝে-মধ্যে জরিপ হওয়া দরকার। আদালতকে মামলা দিয়ে ভর্তি করা প্রশাসনের কাজ নয় এবং তা প্রশাসনিক দক্ষতাও নয়। আইনবিভাগ যুগোপযোগী আইন তৈরি করে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য–নাগরিক দুর্ভোগ বাড়ানো নয়, কমানো। তবে আইনের খসড়ার জন্ম প্রশাসনের অলিন্দে। প্রশাসনকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, তাহলে বিচারিক কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই যে, বর্তমান প্রশাসনের দক্ষতা জনগণকে আশাবাদী করছে না। কেননা তা গণপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। তবে কী করলে জনগণ আশাবাদী হবে, সেটাও খুব জটিল ও কঠিন প্রশ্ন। ফলত বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রশাসনিক দক্ষতার যদি মোটামুটি একটি পোস্টমর্টেম করা হয়, তাহলে হয়তো এর কিছু কারণ এবং সেঅনুযায়ী প্রতিকার খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে চলতে পারে সমসাময়িক পৃথিবীর অনুরূপ বিষয়াবলির তুলনামূলক পর্যালোচনা। বলাবাহুল্য আমাদের আগামীর যাত্রাপথ ও গন্তব্য সুচিহ্নিত করার জন্য এসব খুবই জরুরি।

সহায়ক গ্রন্থ

1. Report of the Administrative and Services Reorganization Committee Part 1: The Services, April, 1973, Dacca.
2. The Civil Service in Pakistan, Chaudhuri Muzaffar Ahmed, NIPA, Dacca, 1969.
3. Government and Politics in Pakistan, Chaudhuri Muzaffar Ahmed, 1968.
4. An Examination of the Criticisms Against Bureaucracy, Chaudhuri Muzaffar Ahmed, 1964.
5. The Civil Servant in Pakistan, Muneer Ahmad, 1964.
6. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় এবং ৩য় খণ্ড, সম্পাদনা: হাসান হাফিজুর রহমান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।
7. Public Personnel Administration, O. G. Stahl, 4th edition, New York, 1956.
8. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় এবং ৩য় খণ্ড, সম্পাদনা: হাসান হাফিজুর রহমান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।
9. Public Personnel Administration, O. G. Stahl, 4th edition, New York, 1956.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

বাংলাদেশে ফুল ব্যবসা : চট্টগ্রামের উপর একটি সমীক্ষা

মুন্সি তানিয়া আফছার*

সারাংশ

ফুল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতার পরিচয় বহন করে আসছে। আধুনিক সভ্যতায়ও ফুলের মূল্য অপরিসীম ও অনবদ্য। পৃথিবীর সকল সমাজেই ফুলের বিশেষ আবেদন রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ-কৃষ্টিতে ফুলের অবস্থান বরাবরই মর্যাদাজনক। স্বাধীনতার পর থেকে বেড়ে চলেছে ফুলের ব্যবহারিক কদর। আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশি ফুলের বাজার সম্ভাবনা আশাপ্রদ। বিশ্ববাজারে শুধু ফুল রপ্তানি করেই কয়েক শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। ফুলচাষে উৎসাহ প্রদান করার জন্য কৃষিব্যাংক চালু করেছে 'ফুলচাষে ঋণপ্রদান'। বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ফুলচাষে অর্থায়নের জন্য নীতিমালা জারি করেছে। ফুলের বাণিজ্যিক মূল্য বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। যাই হোক, এ প্রবন্ধটিতে ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি, বাংলাদেশে ফুলচাষ ও ফুলচাষের প্রকারভেদ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফুলের বাণিজ্যের ধারা, চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ, ফুলের বিপণন ব্যবস্থা, ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতা, ফুল ব্যবসায়ের সমস্যা নিরীক্ষণ এবং ফুলের ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য কতিপয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। এতে দেখা যাবে, ফুলচাষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেই। সরকারি উদ্যোগে ফুল রপ্তানির এবং ফুলের রোগ-বালাই দূর করার জ্ঞানের পর্যাপ্ততা এবং চাষব্যবস্থায় উন্নত গবেষণার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকন্তু ফুলের চাষে প্রণোদনা এবং হরতাল-ধর্মঘটসহ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিত লোকসান থেকে বাঁচার কোনো সুব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে 'পিক-সিজনে' বেশী উৎপাদিত ফুলের সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। বস্তুত ফুলচাষ হচ্ছে এক্ষেত্রে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিদের কোনো রকমের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াই। ফুলচাষে উৎকর্ষ অর্জন এবং ফুল ব্যবসায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এক্ষেত্রে করণীয়ের মধ্যে রয়েছে– ফুল রপ্তানিতে সরকারি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, ফুলপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা, ফুল থেকে ফুলজাত সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করার জন্য গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো, বিদেশ থেকে অবৈধ ফুল আমদানি বন্ধ করা এবং ফুল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ভূমিকা

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি মানব সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফুলের রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য শুধুমাত্র চোখ ও মনের পিপাসাই নিবারণ করে না, বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ফুলের আবেদন সার্বজনীন। আবহমানকাল

*এম.ফিল গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

থেকে এদেশে চলে আসছে ফুলের চাষ ও ব্যবহার। আমাদের দেশে বিগত এক দশকে নাগরিক জীবনে পুষ্পচর্চার ক্রমবিকশিত ধারা লক্ষণীয়। প্রাত্যহিক জীবনে একটি প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য হিসেবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের বাজেটে ফুলের স্থান অবশ্যই নান্দনিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। আর সময়ের দাবি পূরণে ফুলের বিপণন এখন একটি স্বীকৃত পেশা। বাংলাদেশে ফুলের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গায়ে হলুদ, বিয়ে, জন্মোৎসব, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস-সহ যে কোনো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্টীয় আচার-অনুষ্ঠানে ফুলের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন দেখা যায়। শহরে বিয়ের খরচের বাজেটের অন্যতম একটি খরচ হচ্ছে বিয়ের গাড়ি সাজানো, বর-কণেকে বরণ করা, বাসরঘর সাজানো ইত্যাদি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিনিয়ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রকমারি ফুলের চাষাবাদ। ফুলের ব্যবহারিক কদর বেড়ে চলায় বিভিন্ন স্থানের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠছে ফুলের নার্সারি। অভ্যন্তরীণ বাজারে ফুলের কদর ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখে। অনেকেই এখন ফুলের চাষ শুরু করেছে বাণিজ্যিকভাবে। এই সুবাদে শহর বন্দরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে একের পর এক নার্সারি। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ফুলের চাষাবাদে পুঁজির চাহিদা তুলনামুলকভাবে বেশ কম। সে হিসেবে স্বল্প পুঁজির আগ্রহী উদ্যোক্তা তথা শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে এ ব্যবসায়ের প্রতি উৎসাহ বেশি। দেশি–বিদেশি চাহিদার মুখে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মতো অনায়াসে ফুলও একটি সম্ভাবনাময় খাত। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতাসহ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের চাহিদাপূরণ করে অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের মতো ফুল রপ্তানি করেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিশ্ববাজারে শুধু ফুল রপ্তানি করে কয়েকশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের (নন্দী ১৯৯৮)। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে ফুলের চাষাবাদ ও উৎপাদনে যে খরচ হয়, সে তুলনায় বাংলাদেশে ফুলের বাণিজ্যিক উৎপাদানে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ পড়ে এক–তৃতীয়াংশ (কামাল ১৯৯৫)। এ অবস্থায় দেশীয় ফুল নিয়ে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার ধরা কোনো কঠিন কাজ নয়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ৪০ প্রজাতির ফুলচাষ হচ্ছে। কৃষিখাতে উৎপাদনে চলছে নীরব বিপ্লব। দেশের ৮টি জেলার শত শত একর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত ফুল ভারতের একাংশের বাজারও দখল করছে (রেহমান ২০০১)। প্রয়োজনীয় আনুকুল্যে রপ্তানিমুখী কৃষিভিত্তিক পণ্য হিসাবেও ফুল উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদনে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে গত ক'বছর ধরে ঢাকায় আয়োজন করা হচ্ছে জাতীয় পুষ্পমেলা। প্রতিবছরই বাড়ছে জাতীয় পুষ্পমেলার অবয়ব। এর মধ্যে দিয়ে বাড়ছে জনসাধারণের সচেতনতা। বৃদ্ধি পাচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদনের আগ্রহ উৎসাহ।

যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ফুল সম্পর্কে সীমিত আকারে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা, গবেষণা কাজ হয়েছে তার মধ্যে যা পাওয়া যায়, তা হলো–ঢাকা শহরে ফুলের বিপণন পদ্ধতি (হোসাইন ১৯৯৩) বাংলাদেশে ফুল রপ্তানির সমস্যা ও সম্ভাবনা (নন্দী ১৯৯৮) বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনা (বাকী ১৯৯৯)। ফুলের অন্যান্য দিক যেমন ফুলের চাষ, রপ্তানি, মুনাফা ও বিপণন সমস্যা এবং সমস্যা নিরসনে কর্মনীতি অনুসন্ধানের উপর অধ্যয়ন সীমিত। এ শূন্যতা পূরণকল্পে এ নিবন্ধের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি ফুল ব্যবসায়ী, ফুলচাষি, ফুল বিপণনে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, ফুল ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ফুল উৎপাদনকারী এবং ফুলের উপর অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সহায়ক হবে।

এ প্রবন্ধে ফুল ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ গতিধারা অনুধাবনের প্রয়াস বর্তমান। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে: (১) ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি, ফুলের চাষ ও ফুলচাষের প্রকারভেদ অনুসন্ধান; (২) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফুলের বাণিজ্য ও চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ অবলোকন; (৩) ফুলের বিপণন ও ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতা নিরীক্ষণ, এবং (৪) ফুল ব্যবসায়ের নানাবিধ সমস্যা ও এর প্রতিকার তথা উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

এ সমীক্ষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে গোটা বাংলাদেশের পরিবর্তে শুধু চট্টগ্রাম শহরকেই নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের ১৫টি থানার ৩০টি ফুলের দোকান, পাইকারী, খুচরা কারবারী, আড়তদার, উৎপাদনকারী এবং ৩০০ জন বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পেশার ভোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সংগৃহীত তথ্যাবলির আলোকে প্রাপ্ত তথ্য (Findings) নিবন্ধিত হয়েছে। এতে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ ২০১১-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুল দোকানিদের জীবনবৃত্তান্ত সরাসরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফুলসম্পর্কে ভোক্তার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুলের দোকানে বসে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যসমূহ বিভিন্ন প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাবলি ব্যবহারে সাধারণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

এ সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থে পরিচালিত হওয়ায় এর সময় স্বল্প এবং পরিসর সীমিত হয়েছে। ফুল বিপণনের উপর পূর্বে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন একটি উদ্ভাবনী নান্দনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কাজ করায় ক্বচিৎ অনুসন্ধানকে সীমিত

করতে হয়েছে। নমুনা নির্বাচনে জটিলতা, উত্তরদাতার তথ্যপ্রদানে অনীহা, মাধ্যমিক তথ্যের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি

ফুল পরিচর্যা সভ্যতার সমান বয়সী। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ ফুলের পরিচর্যা করত। নৃ-বিজ্ঞানীরা পাঁচ হাজার বছর আগের একটি মালার ফসিল আবিষ্কার করেছেন নেদারল্যান্ডসের সমাধি থেকে (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। তবে বাগ-বাগিচার প্রচলন হয় অনেক পরে। গোলাপ ফুল তার সৌন্দর্যের জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই পৌরাণিক কাহিনিতে ঠাঁই পেয়েছে। গ্রিক উপকথায় প্রেমের দেবী ভেনাসের পায়ের রক্ত থেকে গোলাপের জন্ম। আরব দেশীয় কাহিনিতে আছে, সাদা গোলাপকে বুলবুল পাখি আলিঙ্গন করতে গেলে কাঁটায় আহত হয়ে তার রক্তে সাদা গোলাপ থেকে লাল গোলাপ জন্মে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পদ্মই শ্রেষ্ঠ ফুল বললে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বর্গে নিয়ে সেখানে হাল্কা রঙের একটি সুগন্ধি গোলাপ দেখান। গোলাপ সম্বন্ধে এমন অনেক গল্প আছে। জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রাচীনতম গোলাপের বয়স ২ কোটি ৬০ লক্ষ বছর থেকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ বছর (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)। সম্ভবত আলাদাভাবে ফুলচাষের শুরু হয়েছিল উপাসনাকে কেন্দ্র করে। অনেকের মতে, শরীরসজ্জা ও গৃহসজ্জার জন্য সেকালের অভিজাত মানুষ সুন্দর ও পুষ্পবতী গাছ-লতা বন থেকে তুলে এনে রোপণ করতেন গৃহপ্রাঙ্গণে।

ইতিহাসবিদদের মতে, আর্যসভ্যতার সময় থেকে ফুলচাষ ও পরিচর্যার জন্য একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাদের বলা হতো ফুলমালী; আর যারা ফুলের মালা রচনা করত তাদের পরিচয় ছিল মালাকার (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। মধ্যযুগে রাজন্যবর্গ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দিষ্ট করে মালী ও মালাকার রাখতেন। তখনই বাগান শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল সারা দুনিয়ায়। সম্ভবত সবচেয়ে উন্নত বাগান পদ্ধতির উদ্ভাবক ইংল্যান্ড, রাশিয়া, চীন, মিশর, পারস্য ও ভারতের রাজা-বাদশাহরা। এক্ষেত্রে মোগলদের সুনাম বিশ্বব্যাপী। সেআমলে রচিত পুষ্পবাগিচা এখনও যে কারও নজর কাড়ে। এর মধ্যে কাশ্মীরের নিশাতবাগ সেই ঐতিহ্য ধারণ করে আছে আজও। ফুল বাগানের জন্য সুবিদিত ছিলেন লক্ষ্ণৌর নবাবগণ। যতদূর জানা যায়, উপমহাদেশে সুন্দর গোলাপ এসেছে প্রায় পাঁচশ বছর আগে বসরা থেকে। মোগলসম্রাট বাবর প্রথম 'বসরা' নামের এক গোলাপ নিয়ে এসেছিলেন। সুগন্ধি গোলাপি রঙের এ গোলাপ এখনও এদেশে 'বসরাই গোলাপ' নামে পরিচিত (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বাংলাদেশে ফুল ব্যবসায়ের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি হতে পঞ্চাশের দশকের দিকে ঢাকানগরীতে দুয়েকটি স্থানে ফুল, ফুলের মালা ও

ফুলের তোড়া বিক্রি হতো। তখন শিউলি ও গাঁদা ফুলের মালাই বেশি প্রচলিত ছিল (বিশেষ প্রতিবেদন ১৯৯১)। পঞ্চাশের দশকেও ফুলের কদর খুব একটা দেখা যেত না। তবে বড় বড় ঘরের বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য উৎসবে, পূজা-পার্বণে ফুলের চাহিদা বেড়ে যেত। কিন্তু ফুল কেনার ব্যবস্থা তথা দোকান/ফেরিওয়ালা ছিল খুবই সীমিত। ফুলের প্রয়োজন হলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাগান থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করা হতো। ঢাকায় প্রথম ফুলবিক্রির রেওয়াজ শুরু হয় ইসলামপুর ফাঁড়ির সামনে শাঁখারিপট্টি এলাকায় (কামাল ১৯৯৫)। কিছু ভবঘুরে লোক বিভিন্ন পার্ক থেকে ফুল সংগ্রহ করে এনে এখানে বিক্রি করত। এরপর ফুলের চাহিদা আস্তে-আস্তে বাড়তে থাকে। মুসলিম সমাজেও শুরু হয় মাজারকেন্দ্রিক ফুলচর্চা। ১৯৬২ সালে ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের মাজারকে কেন্দ্র করে তৎসংলগ্ন এলাকায় ফুলবিক্রি শুরু হয়। শুরু করেন এ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা বেকার যুবক হাকিম উল্লাহ (কামাল ১৯৯৫)। মাজারে আগত ভক্তরা এ সময় থেকেই মাজারে ফুল দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। ষাটের দশকে বিভিন্ন সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ফুলের মালা প্রদানের রেওয়াজ শুরু হয়।

স্বাধীনতার পরপরই ফুলের ব্যবহার ও গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বিশেষ বিশেষ দিবস, যেমন–একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে ফুলের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ফুল ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন বিকাশ লাভ করছে। ইসলামপুরে ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে 'গোলাপ বিতান' নামের একটি বিপণী বাণিজ্যিকভাবে ফুলবিক্রি শুরু করে। এর বছর দুয়েক পর শাহবাগ এলাকায় 'মালঞ্চ' ফুল বিক্রয় কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে শাহবাগ মোড়ে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ফুলের মার্কেট। এই মার্কেটে রয়েছে অনেকগুলো ফুলের বিপণি। এর মধ্যে 'মাধুকরী', 'সানফ্লাওয়ার', 'মাধবী' ও 'করবী' হলো পুরনো ফুলবিপণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ বিপণিগুলোতে রয়েছে দৃষ্টিকাড়া নানান ফুলের সমাহার। এই মার্কেটের পাশেই ফুটপাতে প্রতিদিন ফুল নিয়ে বসে বেশ কয়েকজন দোকানি। ফুল ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, ঢাকা শহরে বিপণি ও ফুটপাত মিলিয়ে প্রায় দু'-আড়াইশ স্থানে নিয়মিত ফুল বিক্রি হয়। তবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই সংখ্যা বেড়ে তিন থেকে সাড়ে তিনশ'তে গিয়ে দাঁড়ায় (কামাল ১৯৯৫)। প্রতিটি ফুলের বিপণিতেই এখন গোলাপ এবং রজনীগন্ধা বেশি বিক্রি হয়। এছাড়া বেলী, কাঁটবেলি, গ্লাডিওলাস, গাঁদা, চায়নিজ বেলী, কাঠ-গোলাপসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফুল বিক্রি হয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে অর্কিড, কার্নেশন, এস্টার, জারবেরা, টিউলিপ, লিলি, পদ্ম, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতিও বিক্রি হয় (পারমিতা ২০০২)।

বাংলাদেশের ফুলব্যবসা শুরু হয়েছিল আমদানির মাধ্যমে, যা এখন বেশ পরিণত। এখন দেশের নানাপ্রান্তে নানাজাতের দেশি-বিদেশি ফুলের চাষ হচ্ছে। লাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় অনেক উদ্যমী যুবক ফুলচাষে জড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের তথ্য মতে, ফুলব্যবসায়ী ছাড়াও রাজধানী জুড়ে এখন ৮ থেকে ১০টি ফুল কোম্পানি গড়ে উঠেছে, যারা আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থল ও মঞ্চ ফুল দিয়ে ডেকোরেশনের কাজে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ফলে সমগ্র দেশে বিশেষ করে ঢাকাশহরে ফুলসংক্রান্ত ব্যবসায়ের পরিধি ধীরে-ধীরে বাড়ছে (মাহমুদ ২০১১)।

চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ

চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানা যায়, অধুনালুপ্ত লালদীঘির পাড়ের 'ডায়মন্ড নার্সারি'ই প্রথম ফুলের ব্যবসায় নামে। এরপরই আসে সোসাইটি নার্সারির নাম। রেলওয়ের চাকুরে মরহুম মোশাররফ হোসেন ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত কে. সি. দে রোডস্থ সোসাইটি ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৯৫০ সালে এখানকার চত্বরে নার্সারি গড়ে তোলেন। এরপর তিনি ফুল উৎপাদকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারফ্লোরা'র সদস্য হন (চৌধুরী ২০০১)। বর্তমানে সোসাইটি নার্সারি থেকে রকমারি ফুলের বীজ বিক্রি হয়। সোসাইটি নার্সারির পর মুরাদপুরের চিটাগাং নার্সারির নামটি উল্লেখ্যযোগ্য। এটি 'খুইল্ল্যা মিয়ার নার্সারি' নামে সমধিক পরিচিত এবং মালিক খুইল্ল্যা মিয়া মারা যাওয়ার পর এরও বিলুপ্তি ঘটে। চট্টগ্রামের প্রাচীন হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ন্যাশনাল নার্সারির মালিক সুধাংশু বিমল শীল। তিনি প্রথমে পুরাতন গীর্জায় ব্যবসা শুরু করলেও পরে নন্দনকাননস্থ ডিসি হিলের পাদদেশে নার্সারি নিয়ে আসেন। বর্তমানেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং এখন ফুলের ব্যবসা করছে তার দু'সন্তান।

বর্তমানে ডিসি হিল বা এর আশেপাশে বহু নার্সারি বা ফুলবিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নন্দনকাননস্থ ১নং গলির মুখে 'বাহাদুর' নার্সারি, এরই একটু পরে ডিসি হিলে উঠার রাস্তার সম্মুখে 'ডালিয়া' ফুল বিক্রয় কেন্দ্র এবং মোমিন রোডে 'বাংলাদেশ নার্সারি'র সামনেই রয়েছে 'রজনীগন্ধা'; আর ডিসি হিলের কোলে রয়েছে 'গার্ডেন ফ্লাওয়ার' নামে ফুল বিক্রয় কেন্দ্র। ইদানীং চেরাগি পাহাড়ের সম্মুখে বেশ কয়েকটি ফুল বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 'হেভেন ফ্লাওয়ার', 'স্টার পুষ্প বিতান,' 'অপরাজিতা', 'শাহ আব্দুল মজিদিয়া পুষ্প কেন্দ্র', 'চেরাগী ফ্লাওয়ার ভিউ' ইত্যাদি ফুল বিক্রয় কেন্দ্রগুলো এর মধ্যে অন্যতম। চট্টগ্রামের প্রায় সব জায়গাতেই এখন ফুলবিক্রয় কেন্দ্র ও নার্সারি গড়ে উঠেছে। টাইগারপাসে 'মডার্ন নার্সারি', লালখান বাজার মোড়ে 'পুষ্পকলি', 'পুষ্পনীড়', 'বনলতা', 'ফ্লাওয়ার হাউজ'; ওয়াসার মোড়ে জমিয়াতুলফালাহ সংলগ্ন 'আরণ্যক', এম. এম. আলী সড়কের মুখে 'ফ্লাওয়ার ল্যান্ড',

কাজির দেউড়ির অ্যাপোলো শপিং কমপ্লেক্সে 'মালঞ্চ', কল্লোল সুপার মার্কেটে 'কাননপুর', 'মাধব', প্রবর্তক মোড়ে 'নন্দন', 'রূপসা', 'মহুয়া', গোলপাহাড়ের মোড়ে 'কনকচাঁপা', চকবাজারে 'পুষ্পমঞ্চ', 'পুষ্পমেলা', 'মাধুকরী', 'সবুজ বিপ্লব', কাতালগঞ্জে 'বনফুল', হালিশহরে 'পুষ্প মালঞ্চ' ইত্যাদি ফুল বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া নিউমার্কেটের একতলায় 'মৌসুমী', নিউমার্কেটের মোড়ে 'নিউ মার্কেট ফুলের দোকান', 'সিটি ফ্লাওয়ার কর্নার', নালাপাড়ায় 'নিউ রূপসা', আগ্রাবাদে 'মায়ের দোয়া', 'গাউসিয়া', 'হাসনাহেনা', 'করবী', চৌমুহনীতে 'কর্ণফুলী', 'প্রভাতী', লালদীঘির পাড়ে 'পুষ্পবিতান' ছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতে ফুলের ব্যবসায় জমজমাট। এমনকি শহরের অনেক পাড়ায় স্টেশনারি দোকানগুলোতেও এখন রজনীগন্ধা, গোলাপ, বেলী ফুলের মালা বিক্রি হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ফুল ও ফুলের মালা হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। এমনিভাবেই গত দশ বছরে প্রায় পুরো চট্টগ্রাম শহরে ফুলের ব্যবসায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে চট্টগ্রামে ৩৭০টির মতো ফুল বিক্রির দোকান রয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরে ফুল পছন্দের ক্ষেত্রে চাহিদার ক্ষেত্রে রজনীগন্ধা ও গোলাপ-ই অধিক প্রিয়। এছাড়া ভিন্ন রুচির কিছু ক্রেতার মধ্যে অন্যান্য ফুলের কদর রয়েছে। রজনীগন্ধা খুব সুগন্ধি মনোরম ফুল বলেই চট্টগ্রাম শহরের মানুষ একে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এ ফুল রাতের বেলায় সুগন্ধ ছড়ায়। এজন্যে এর নাম রজনীগন্ধা। দণ্ডের নীচের ফুলগুলো প্রথমে ফুটতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে উপরের কুঁড়ির পাপড়ি ফোটে। রজনীগন্ধার আসল দেশ মেক্সিকো (রিফেল-২০০০)। রজনীগন্ধা বহুদিন পর্যন্ত টাটকা থাকে। এ ফুলের চাষ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হলেও সবচেয়ে বেশি হয় যশোহর এলাকায়। বাংলাদেশে বর্তমানে সারাবছরই রজনীগন্ধা পাওয়া যায়। ফুলের চাষি বা ফুল ব্যবসায়ীরা যেমন চট্টগ্রামের দোকানগুলোতে রজনীগন্ধা দিয়ে যায়, তেমনি দোকানগুলোর মালিকেরাও যশোহর গিয়ে ফুল ক্রয় করে থাকেন। বর্ষাকালে রজনীগন্ধার দাম খুব কম এবং শীতকালে খুবই বেশি হয়। ফুলের মধ্যে বর্ণ, গন্ধ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে গোলাপই শ্রেষ্ঠ। তাইতো গোলাপকে 'ফুলের রানি' নামে ডাকা হয়। গোলাপের আসল দেশ ইরান। বাংলাদেশের সর্বত্রই গোলাপ পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম নার্সারিতে গোলাপ চাষ করা হয়। গোলাপ ফুল ঢাকার সাভার অঞ্চলে খুব বেশি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গোলাপের ঋতু শীতকাল; তবে অনেক গাছে সারাবছরই ফুল ফোটে। সাদা, হলুদ, গোলাপি, লাল, কালচে লাল ও বেগুনি আভাযুক্ত নানা ধরনের গোলাপ জন্মায় আমাদের দেশে। তবে কালচে লাল রঙের যে গোলাপ বা 'ব্লাক প্রিন্স' রয়েছে– সেটি বাংলাদেশে দুর্লভ।

চট্টগ্রামের ক্রেতাদের কাছে সাধারণত বেলী ও রজনীগন্ধার মালাই অধিক প্রিয়। এছাড়া রয়েছে গোলাপ ফুলের মালা, গাঁদা ফুলের মালা, শিউলি ফুলের মালা

ইত্যাদি। বেলী ফুল আসে নারায়ণগঞ্জ ও সাভারের নার্সারিগুলো থেকে। গাঁদা ফুলের মালা সাধারণত গায়ে হলুদ, বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। গাঁদাফুল নানা জাতের হয়, যেমন–ছোট, বড়, হলুদ, কমলা রঙের। তাই ছোট ও বড় এবং মান ও রং অনুযায়ী গাঁদা ফুলের মালার দামেরও তারতম্য হয়।

ফুল বিপণনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ফুল ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা ক্রমবর্ধমান এই ব্যবসাটি কর্মসংস্থান ও সঞ্চয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। ফুলের বাজারজাতকরণ বহুবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ফুল শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দামি সুগন্ধি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ প্রভৃতি তৈরিতে ফুলের ব্যবহারের জুড়ি নেই। তাছাড়া ফুল মধু সংগ্রহের অন্যতম উৎস। প্রাচীনকাল থেকেই গোলাপ বহুল ব্যবহৃত ফুল। ইতিহাসখ্যাত রাজা-রানিদের কাছে গোলাপ সর্বদাই আদৃত হয়েছে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এদেশে গোলাপপানির বা গোলাপজলের ব্যবহার করা হয়। মোগল সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের আবিষ্কৃত 'আতর-ই-জাহাঙ্গির' থেকে গোলাপের আতর প্রচলিত হয়। গোলাপ দিয়ে জেলি, মিষ্টি, হালুয়া ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রী ও সুগন্ধি তৈরি করা যায়। ভেষজ হিসেবেও গোলাপ গাছ ব্যবহৃত হয়। গোলাপের ফল ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে গোলাপের উৎপাদন ও বিপণন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সালনা ও সাভারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে এখন গোলাপের চাষ হচ্ছে (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

গৃহসজ্জায়ও ফুল ব্যবহৃত হয়। মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। টেবিলের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখতে কে না ভালোবাসে? মানুষ এখন নিজের শোবার ঘরে আত্মিক তৃপ্তির জন্য ফুল রাখে। অতিথিদের কাছে ড্রয়িং রুমটিকে আরো আকর্ষণীয় করার মনোবাসনায় ফুলদানিতে স্থান দেয় রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্লাডিওলাস ইত্যাদি হরেক রকমের ফুল। খাওয়ার সময় ডাইনিং টেবিলেও বিভিন্ন পদের ও স্বাদের খাবারের পাশাপাশি নানান বর্ণের ও গন্ধের বাহারি ফুল রাখা হয়।

উপহার হিসেবেও ফুলের ব্যাপক কদর রয়েছে। খাদ্য পেটের ক্ষুধা মেটায় আর ফুল মেটায় চোখ আর মনের ক্ষুধা। এখন মানুষ হৃদয়ের কাছের ও দূরের সব মানুষকেই ফুল উপহার দিতে ভালোবাসে। জন্মদিনে, মৃত্যুবার্ষিকীতে, বিয়ের অনুষ্ঠানে কনেকে পুষ্পবৃষ্টিতে বরণ, বাসরঘরের বিছানাতে, মেঝেতে, দেয়ালে সর্বত্রই ফুলের বর্ণিল অস্তিত্ব। তাছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে অতিথিকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যও ফুল ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায়, অফিস থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত ফুলের ব্যবহার বিস্তৃত। বিদেশিদের ফুল দিয়ে বরণ করা তো রীতিমত রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে।

ফুলের আরো বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। ফুল আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকেই শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যে প্রায়শই ফুল ক্রয় করে থাকেন। রমণীগণ নিজেদের খোঁপায় ফুল পরে সাজার জন্য ফুল ক্রয় করেন। অনেকে অফিস থেকে ফেরার পথে ফুল ক্রয় করেন প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য। আজকাল অনেকেই প্রিয়জনদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিদেহী আত্মাদের স্মরণ করবার জন্য। ইদানীং হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার সময়ও অনেকে ফুলের তোড়া ও ফুল নিয়ে যান। আগের প্রচলিত রেওয়াজ অর্থাৎ রোগী দেখতে হরলিক্স বা ফলের পরিবর্তে এখন ফুলের কদর বেড়েছে। তাছাড়া আজকাল টিভিতে প্রচারিত প্রায় অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনেই ফুলকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। মাজার-মন্দিরেও ফুলের ব্যবহারের জুড়ি নেই।

ফুলের চাষ

পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ বা সকল ফসল একটি নির্দিষ্ট স্থানে হয় না। কোনো দেশে কোনো কোনো উদ্ভিদ ভালোভাবে জন্মাতে পারে, আবার অন্যগুলো অন্যদেশে ভালোভাবে জন্মে। অর্থাৎ প্রতিটি উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন হয় আলাদা আলাদা ভৌগোলিক পরিবেশ। এ পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তুষার, বায়ুপ্রবাহ, মাটি ইত্যাদি। আমাদের দেশে যে জলবায়ু বিদ্যমান তাতে স্থানীয় ফুলগুলো ভালোভাবেই জন্মে থাকে এবং এ দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমির মাটি ফুলের জন্য উপযোগী (নন্দী ১৯৯৮)। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করার জন্য সব ফুল চাষের আওতায় আনা হচ্ছে না। সাধারণত বাজারে কাট ফ্লাওয়ার (কাটা ফুল) হিসেবে এবং মালা তৈরির জন্য যে সমস্ত ফুলের চাহিদা রয়েছে শুধু সেগুলোকেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বাজারে, দোকানে সচরাচর যে ফুলগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো–গোলাপ, বেলী, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা ও গ্লাডিওলাস। তাছাড়া ফুলের বিভিন্ন আইটেম তৈরির জন্য টুইগ হিসেবে কতগুলো উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হচ্ছে ঘাসফুল, দূর্বা, পানপাতা, ঝাউপাতা ও কামিনী পাতা। ফুলচাষের জন্য যদিও আমাদের দেশে আলাদাভাবে কোনো জমি রাখা হয় না কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য অন্যান্য ফসলের মতোই ঐ সব ফুলের উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত বসতবাড়ির আশেপাশের পতিত উঁচু জায়গা ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা হতো। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এখন ফুল চাষের জন্য উপযুক্ত খোলা মাঠ বাছাই করা হচ্ছে। ফুল চাষের জন্য উঁচু, বন্যামুক্ত, সূর্যালোকপূর্ণ দো–আঁশ বা বেলে দো–আঁশ মাটি দরকার। অন্যদিকে ফুল যেহেতু একটি পচনশীল বস্তু, সেহেতু এর দ্রুত পরিবহনের জন্য পরিবহন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে লক্ষ করলে বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গার সঙ্গেই আজ

যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং তা দিনকে-দিন উন্নত হচ্ছে। সুতরাং ফুল উৎপাদনকারী চাষিদের জন্য এটা একটা ভালো সুযোগ।

ফুলচাষ এখন উদ্ভিদবিদ্যার শাখা এবং উচ্চতর গবেষণার বিষয়। উষ্ণ মরুতেও ফুলচাষ হচ্ছে এবং পুষ্পশোভিত হচ্ছে বালুকা প্রান্তর। বলাবাহুল্য আজকাল বাংলাদেশে ফুলচাষ হচ্ছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে ফুলচাষ শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালের দিকে। তবে ফুলক্ষেত বলতে যা বোঝায় তার সূচনা ১৯৮৪ সালে যশোহরের ঝিকরগাছায়। পরে ফুলচাষ বিস্তৃত হয় যশোহরের সদর, শার্শা ও চৌগাছা উপজেলায় এবং কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও সাতক্ষীরা জেলায়। জানা যায়, ঝিকরগাছা থানার পার্শ্ববর্তী এলাকা গদখালি, পানিসারা, টাউরা, নীলকণ্ঠ নগর, বর্ণি, চাঁপাতলা, শিওরদহ, ফুলিয়া, কলাগাছি, হাড়িয়া, বাইশা, চাঁদপুর, মানিকখালি ও নাভারণ এবং ঝিনাইদহের মহেশপুর এলাকায় ফুল চাষ হয়। বেশি হয় রজনীগন্ধা ও গাঁদা। ১৯৯৮ সালে ঝিকরগাছায় রজনীগন্ধার চাষ হতো দু'হাজার একর জমিতে, বর্তমানে ঝিকরগাছা ও শার্শা থানার ছয় ইউনিয়নের ৯০টি গ্রামে ফুলের চাষ হচ্ছে। প্রায় চার হাজার বিঘা জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে কয়েক কোটি টাকার ফুল (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। এসব এলাকায় রজনীগন্ধা ও গাঁদার পাশাপাশি বাড়ছে গোলাপ ও গ্লাডিওলাসের চাষ। যশোহরে রজনীগন্ধা ও গাঁদা ছাড়াও শুরু হয়েছে কালার গ্লাডিওলাস এবং খয়েরি গাঁদার উৎপাদন।

বাংলাদেশে ফুল চাষের দিক থেকে যশোহর ও ঝিনাইদহ সবচেয়ে অগ্রগামী। দেশের মোট ফুল চাষের সিংহভাগই এ দুটি জেলায় হয়ে থাকে। ফুলের বাজার হিসেবে শীর্ষে থাকা যশোহরের ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলার ৬৫টি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ হচ্ছে। এসব ফুলের মধ্যে রয়েছে–গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, জারবেরা, গাঁদা ও জিপসি (মাহমুদ ২০১১)। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, দোলনচাঁপা, জিপসি, স্নোবাল, এস্টার ফুলের চাষ হচ্ছে সাভারের আবদুল্লাপুর, ধামরাই, নবীনগর ও রাজসন এবং মিরপুরের নওয়াবের বাগ এলাকায়। জয়দেবপুরের কাশিমপুর বিএডিসি ফার্মেও প্রচুর রজনীগন্ধা ও গ্লাডিওলাস উৎপন্ন হতে দেখা যায়। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া, বন্দর এবং হাফদিতে উৎপন্ন হয় বেলী, চায়না বেলী ও শীতের গাঁদাফুল। দেশের ভিতর চাষের প্রধান অঞ্চল হচ্ছে এগুলো। তবে দেশের সব শহরের নার্সারিতে এবং আশেপাশের শহরতলিতে গোলাপ, গ্লাডিওলাস, গাঁদাসহ আরো রং-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হয়। কালিয়াকৈর এবং নরসিংদীতে নিয়মিত চাষ হয় কামিনী এবং বাহারি গাছ ঝাউ ও পাম। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে ঘাসফুল, দূর্বা–এসবও আসে। এগুলো ফুলের তোড়া, বাস্কেট ও বিভিন্ন রকম ফুলের আইটেম তৈরিতে টুইগ বা সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের হাটহাজারি, চকোরিয়া ও মিরেরসরাইতে বেশ কয়েকটি গোলাপের বাগান

গড়ে উঠেছে। তাছাড়া এসব থানায় বেশ কিছু কৃষক গাঁদা ফুলের চাষও করে থাকে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৪০ রকমের ফুল চাষ হচ্ছে। সাধারণ কৃষক ছাড়াও ফুলচাষে এগিয়ে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকেরা।

একুশ শতকের অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন বিষয়ে এবং খাতে ব্যাংকের ঋণপ্রদান করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ফুলচাষের জন্য চালু করেছে 'ফুল চাষে ঋণপ্রদান'। ফুলচাষ যেহেতু একটি লাভজনক ব্যবসা, সেহেতু এ খাতে অর্থায়ন করা কৃষি ব্যাংকের একটি যুগান্তকারী ও আধুনিক চিন্তাধারা। এখন ফুলের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই ফুলের উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে করার প্রবণতাও বাড়ছে। আমাদের দেশে রজনীগন্ধা, গোলাপ, ক্যালেরিয়া এবং গাঁদা প্রভৃতি ফুলচাষ বৃদ্ধিতে কৃষিব্যাংক অর্থায়ন করতে শুরু করেছে। স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পর ফুল রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ১৩/৫/২০০১ তারিখে ফুল চাষে অর্থায়নের বিষয়ে নীতিমালা জারি করেছে। ফুলের নির্যাস হতে আতর, গোলাপ, খোশবু ও সুগন্ধি তৈরি ফুলের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক এবং এ ক্ষেত্রেও কৃষিব্যাংক সহায়তা দেবে বলে জানা যায় (মুরাদ, ২০০১)।

নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশে কৃষিব্যাংক হতে প্রকৃত ফুলচাষি অথবা ফুলচাষে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ফুল চাষের অনুমোদিত এলাকার শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। যশোহর অঞ্চলের ঝিকরগাছা, নাভারণ, শার্শা, লক্ষ্মণপুর, কায়েসখোলা, যশোহর ও চৌগাছা শাখা, সাতক্ষীরা অঞ্চলের খোরদো বাজার, কলারোয়া, বালিয়াডাঙ্গা বাজার ও সোনাবাড়িয়া শাখা, ঝিনাইদহ অঞ্চলের সিঙ্গিবাজার, কোট চাঁদপুর, মহেশপুর, বালিয়াডাঙ্গা ও কালীগঞ্জ শাখাগুলো ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে ঋণের আবেদন ও যথাযথ মূল্যায়ন শেষে ঋণ বিতরণ করে আসছে। বর্তমানে উক্ত তিন জেলার ১৬টি শাখা ফুলচাষে ঋণ নিয়মিত বিতরণ করছে (মুরাদ ২০০১)। সুদের হার শস্যঋণের ন্যায় ১৩%, যা সবসময় সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। শস্যঋণের ন্যায় প্রচলিত নিয়মাচার পালন করে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে পারেন। ৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ঋণ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মঞ্জুর করতে পারেন। শস্যঋণের ব্যতিক্রম হিসেবে ন্যূনতম ৫ শতক জমির জন্য ফুলচাষে ঋণপ্রদান করা হয় এবং বর্গাচাষিগণও এ ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। রজনীগন্ধা ফুলচাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা, ক্যালেরিয়া চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা, গাঁদাফুল চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ১৭,০০০ টাকা এবং গোলাপ চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ৩৭,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ পরিশোধ করার জন্য ৬ মাস হতে ১৮ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়ে থাকে, যা

ফুল উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রি করা পর্যন্ত যথাযথ সময় বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য ফুল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি দেশের যে কোনো এলাকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তা গ্রহণের নিমিত্তে শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ–১ এর সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার লক্ষ্যে ফুলচাষে ঋণপ্রদান দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে ফুল চাষের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের জলবায়ু ফুল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে শীতকালে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এখনও শৌখিন ও পেশাদার–উভয় ধরনের ফুল চাষই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখানে কাটাফুল প্রধানত গোলাপ, রজনীগন্ধা, অর্কিড ও গ্লাডিওলাস, বাহারি পাতার গাছ ও মৌসুমি ফুলের বীজের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে সীমিত পরিমাণ গোলাপ ও রজনীগন্ধা রপ্তানি হচ্ছে। দেশি ও বিদেশি বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত নার্সারি গড়ে উঠছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই দেশে কাটাফুলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত ফুল দিয়েই এখানে এই ব্যবসায়ের শুরু। রাজধানী ও অন্যান্য শহরে ফুলের চাহিদা মিটানোর জন্য কিছু কিছু চাষি বাণিজ্যিকভিত্তিতে ফুলচাষ আরম্ভ করেন। ফুলের বাণিজ্যিক চাষাবাদে সহায়তা যোগানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি পুষ্পচর্চা গবেষণা কেন্দ্র চালু করেছে। বাজারে নিয়মিত বিক্রেয় স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ফুলের মধ্যে রয়েছে কয়েক জাতের গোলাপ, গ্লাডিওলাস, হলুদ, কমলা ও লাল রঙের গাঁদা, কয়েক জাতের চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা ও জলপদ্ম। এছাড়া স্থানীয়ভাবে পরিচিত করবী, জুঁই, কামিনী, শাপলা, দোলনচাঁপা, ডালিয়া এবং জিনিয়া ফুলও মাঝে-মধ্যে পাওয়া যায় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

অনুকূল ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর সুবাদে বাংলাদেশ একটি উদ্ভিদসমৃদ্ধ অঞ্চল। অধিকন্তু হিমালয়, বার্মা-মালয় ও পূর্বভারতের উদ্ভিদ জগতের মিলনস্থল বিধায় এখানে প্রজাতির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক। যুগযুগ ধরে এমন সমৃদ্ধ প্রকৃতির মাঝখানে বসবাসরত বাংলার মানুষ স্বভাবতই উদ্ভিদঘনিষ্ঠ ও পুষ্পপ্রেমিক, আর সেই সাক্ষ্য আছে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে। লোকগাঁথা ও লোকগীতিতে, এমনকি তাম্রলিপিতেও। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে পূজার্চনার জন্য ফুলের যোগান দিতে নিশ্চিতই বাগান ছিল গৃহাঙ্গন ও মন্দিরে, ধ্যানার্থীর তপোবনে এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য রাজন্য

ও অভিজাতদের প্রাসাদে। এসব ফুলের সবই আজ দেশজ ও বনজ। আজও আমাদের পাহাড় ও বনাঞ্চলে অনেক প্রজাতির ফুল আছে যেগুলো বাগানে লাগানো যায়। তবে মোগল সম্রাটেরাই ভারতে প্রথম সংগঠিত ও নির্দিষ্ট নকশার উদ্যানরীতি প্রবর্তন করেন। তাঁরাই এদেশে আনেন মধ্যপ্রাচ্যের গাছপালা, চীনের গোলাপ, লিলি ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন হওয়ায় এদেশে মোগলশৈলীর উদ্যানের কোনো বিবর্তন আর ঘটেনি। আজও ভারতীয় উদ্যান বলতে মোগল উদ্যানই বোঝায়। এদেশের বাগানের গাছপালার সিংহভাগই বিদেশি। এগুলো এনেছেন রাজা-বাদশা, পরিব্রাজক, বণিক, ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের কর্মচারীরা। বাংলাদেশের বাগানের ফুলগুলোর মধ্যে ভারত, মায়ানমার ও মালয় ছাড়াও আছে চীন, জাপান, আফ্রিকা ও ক্রান্তীয় আমেরিকার বহু প্রজাতি। পরিচিতির সুবিধার্থে এগুলোকে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, কন্দমূলীয় ও মৌসুমি ঔষধিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বৃক্ষ: পুষ্পবৃক্ষ সাধারণত লাগানো হয় পার্ক, বড় বাগান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের চত্বরে। সুশ্রী পাতা, রঙিন প্রস্ফুটন ও মধুর গন্ধের জন্য এগুলো আকর্ষণীয়। উল্লেখ্যযোগ্য বৃক্ষ–শিরীষ, ছাতিম, কদম, দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, শিমুল, পলাশ, বটলব্রাস, সোনালু, সোনাইল/কর্ণিকার, লাল সোনাইল, সিনজিরি, নাগলিঙ্গম, বরুণ, কৃষ্ণচূড়া, গ্লিরিসিডিয়া, কুরচি, কুটজ, গিরিমল্লিকা, জারুল, বিলাতি জারুল, হিমচাঁপা/উদয়পদ্ম, নাগেশ্বর, বকুল, শেফালি, পেল্টোফরাম, কাঁঠগোলাপ, গৌরচাঁপা, গোলকচাঁপা, গোলাচি, অশোক, কলকে ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক বাগানে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কিছু দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি–পুন্নাগ/সুলতান চাঁপা, স্কারলেট, কর্ডিয়া, গুস্তাভিয়া, পলকজুঁই, জ্যাকারান্ডা, মিলেসিয়া, আকাশনীম/হিমঝুরি, কনকচাঁপা, রামধনচাঁপা, রুদ্রপলাশ, পরশপিপুল ইত্যাদি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

গুল্ম: এগুলো গোড়া থেকে শাখায়িত; সাধারণত চিরসবুজ ও বর্ষজীবী, ছোটবড় সব ধরনের বাগানেই লাগানো হয়। বাগান সজ্জার এই প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে আছে শিবঝুল/শিবজটা, ঘণ্টাফুল, ঝিণ্টি কুরুবক, স্বর্ণঝিণ্টি, কাঞ্চন, রাঁধাচূড়া, হাস্নাহেনা, ধুতরা, লালপাতা, পাতাবাহার, গন্ধরাজ, জবা, স্থলপদ্ম, লাল রঙ্গন, হলুদ রঙ্গন, গোলাপি রঙ্গন, সিঙ্গাপুরী রঙ্গন, কুন্দ, বেলী, ফুরুস, গুয়েগাঁদা, লঙ্কাজবা, সন্ধ্যামালতী/সন্ধ্যামণি, কামিনী, নাগবল্লী, রক্তকরবী, গোলাপ, টগর, নয়নতারা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য গুল্মের মধ্যে রয়েছে: লাল ঘণ্টাফুল, ছোট ঘণ্টাফুল, ব্রুনফেলসিয়া, কেলিস্টেমন, রাজঘণ্টা, ডম্বিয়া, ঝুমকোজবা, নীলজবা, স্বর্ণচামেলি, জেট্রফা, জহুরিচাঁপা, দাঁতরাঙ্গা/লুটকি, অঞ্জল, নীলচিতা, রন্ডেলেসিয়া, রাসেলিয়া, সোনাপাতি, নীলঘণ্টা ইত্যাদি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

লতা: এগুলোর অধিকাংশই বহুবর্ষজীবী, কাণ্ড দুর্বল বিধায় নিজেই কিংবা আঁকশি,

কাটা ইত্যাদি উপাঙ্গের সাহায্যে কোনো আশ্রয় জড়িয়ে উপরে উঠে। এগুলো মাটিতে তেমন জায়গা দখল করে না বলে ছোট বাগানেও বেশি সংখ্যায় লাগানো যায়; দালান, ফটক, বেড়া ইত্যাদিতে লতা বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অনেক প্রজাতি রঙিন ফুল ও অন্যগুলি সুগন্ধি প্রস্ফুটনের জন্য আকর্ষণীয়। লতানো গোলাপ ও বাগান বিলাসের জন্য এদের বিশেষ সমাদর। বাগানের সাধারণ লতার মধ্যে আছে– মালতি লতা, হলুদ ঘণ্টাফুল/হরকাকরা, অনন্তলতা, কাঁঠালিচাঁপা, বাগানবিলাস, ট্রাম্পেট ক্লাইম্বার, ব্লিডিং, হার্ট, অপরাজিতা, উলটচণ্ডাল, ভাদ্রা, মাধবীলতা, চন্দ্রমুখী, দুধিয়ালতা, রেললতা, মর্নিংগ্লোরি, জুঁই, চামেলি, যূথিকা, হ্যানিস্যাকল, ঝুমকোলতা, নীলমণি লতা, লতাপারুল, গোল্ডেন শাওয়ার, তারামণি লতা, কুঞ্জলতা, মধুমালতী/মধুমঞ্জরী লতা প্রভৃতি।

কন্দজঃ এগুলো সাধারণত বহুবর্ষজীবী; সচরাচর শীতে মরে যায় এবং বসন্ত-গ্রীষ্মে আবার গজায়। কোনো কোনোটির ফুল খুবই আকর্ষণীয়, কোনোটি বা সুগন্ধি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–বেলেডনা লিলি, গ্লাডিওলাস, ফায়ারবল লিলি, দোলনচাঁপা, স্পাইডারলিলি, ভূঁইচাঁপা, রজনীগন্ধা ও ঘাসফুল (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

মৌসুমি ফুলঃ এগুলো সাধারণত শীতের শুরুতে চাষ করা হয়। কোনো কোনোটি বর্ষায়ও। শীতের বিবর্ণ প্রকৃতিতে নানা রং ছড়ায় বলে এগুলোর বিশেষ সমাদর। অধিকাংশই বিদেশি। এগুলোর মধ্যে আছে–অ্যাজিরাটাম, হলিহক, অ্যান্টারিনাম, ক্যালান্ডুলা, অ্যাস্টার, মোরগফুল, করন ফ্লাওয়ার, সুইট সুলতান, চন্দ্রমল্লিকা, ক্যারিওপসিস, কসমস, বর্ষাতি কসমস, ডালিয়া, লার্কস্পার, সুইট উইলিয়াম, কার্নেসন, পিংক, গ্যালার্ডিয়া, সূর্যমুখী, বোতামফুল, স্ট্র ফ্লাওয়ার, দোপাটি, মর্নিংগ্লোরি, সুইট পি, লবেলিয়া, লুপিন, পপি, পেটুনিয়া, ফ্লকস, পর্তুলেকা, স্যালভিয়া, গাঁদা, কালী গঁদ্দা, ন্যাস্টারসিয়াম, ভার্বেনা, পেনসি, জিনিয়া প্রভৃতি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বাংলাদেশের মোট ফুলের সিংহভাগই চাষ হয় যশোহর ও ঝিনাইদহ জেলায়। এখানকার ফুলের চালান ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সহ দেশের ৫৪টি জেলায় যায়। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গদখালির (যশোহর) পাইকারি বাজারে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয়। ফুলচাষি সমিতির দেয়া তথ্যমতে, বর্তমানে এলাকার ৪ হাজার ৫০০ কৃষক ১ হাজার হেক্টর জমিতে ফুল চাষ করছেন। এর সঙ্গে জড়িত ৪ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা। এখন বছরে যশোহরের ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলায় ১০০ কোটি টাকার ফুল উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকার মাঠ থেকে প্রতিদিন ৫ হাজার গোছা ফুল রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রির জন্য আসে। তবে যশোহর ও ঝিনাইদহের

পাশাপাশি এখন মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ও বগুড়াও ফ্লাওয়ার জোন হিসেবে গড়ে উঠেছে। ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহে ৩ হাজার বিঘা জমিতে নানা জাতের ফুল চাষ হচ্ছে। জেলা সদর, মহেশপুর ও কালীগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি গ্রামে ব্যাপকহারে ফুল চাষ হচ্ছে। ২০০৮ সাল থেকে এসব এলাকায় জারবেরা ফুল আর ২০০৯ সাল থেকে লিলিয়াম ফুলের চাষ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাঙ্গালোরের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে জারবেরার চাষ করা হচ্ছে। টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি স্থানে দেশি ফুলের চাষ হচ্ছে (মাহমুদ ২০১১)।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামেও ফুল চাষের আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামের চকোরিয়ার বরইতলি গ্রামে ৪০ শতক জমিতে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। ২০০১ সালে তিন একর জমিতে গোলাপের চাষ করা হয়। বর্তমানে বরইতলির ১০০ একর জমিতে গোলাপের চাষ হচ্ছে (কুদ্দুস ২০১১)। কক্সবাজার–চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে পাহাড়ি এলাকায় গোলাপ বাগান রয়েছে ৩০টি। পশ্চিমপাশে ফসলি জমিতে রয়েছে ২০টি। অন্যগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গ্রামে। মেরেন্ডা (লাল), রাম্বার (হলুদ), জরিনা সুন্দরী (রোদে রং পরিবর্তিত হয়), লিংকন (গাঢ় লাল) গোলাপ চাষ হয় এখানকার বাগানগুলোতে। গোলাপ বাগান মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, সারাবছর চাহিদা থাকে গোলাপের এবং চাষও হয় বছরজুড়ে। তবে শীত মৌসুমে ডিসেম্বর–এপ্রিলে গোলাপের চাহিদা থাকে বেশি। কারণ এসময়ে বিয়ে, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন্স ডে সহ বিভিন্ন উৎসব থাকে। বাগান মালিকদের কাছ থেকে জানা যায়, বাগানের ৮০ শতাংশ গোলাপ সরবরাহ করা হয় চট্টগ্রাম শহরের চেরাগি পাহাড়ের দোকানে। অবশিষ্ট গোলাপ যায় কক্সবাজার শহরে।

গোলাপ ছাড়াও চট্টগ্রামের দোহাজারি, চকোরিয়ার বরইতলিতে বোতামফুল ও অর্কিডের চাষ হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় অর্কিডের সরবরাহ অনেক কম। অর্কিডের গণ ও প্রজাতির সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৭০০ ও ২০,০০০; শীতলতম অঞ্চল ছাড়া গোটা বিশ্বে বিস্তৃত, আর্দ্র-ক্রান্তীয় এলাকায়ই অধিক পাওয়া যায়। অর্কিড বহুবর্ষজীবী ঔষধি, পরাশ্রয়ী বা ভূমিজ, কখনও শিলা উদ্ভিদ বা মৃতজীবী; পরাশ্রয়ী সদস্যরা প্রধানত ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের এবং ভূমিজ প্রজাতিগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। বর্ণাঢ্য পুষ্পপুটসহ বাঁকানো গড়ন অর্কিড ফুলের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রায় ২০০ প্রজাতির অর্কিড জন্মে। সারাবছর কিছু কিছু অর্কিডের ফুল ফুটলেও জানুয়ারি–জুন হলো ফুল ফোটার সময় এবং সর্বাধিক ফোটে মার্চ–এপ্রিলে। ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক বিবেচ্য অর্কিড। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী বিদেশি অর্কিডের সঙ্গে দেশি অর্কিড সংগ্রহ ও বিপণনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অর্কিডের স্বাভাবিক বাসস্থানের গাছপালার অবাধ ধ্বংস ও অতিমাত্রায় অর্কিড সংগ্রহের জন্য

কিছু পরাশ্রয়ী অর্কিড ইতোমধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় অর্কিডের জার্মপ্লাজমের বৃহত্তম সংগ্রহ রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্কিডশালায় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

ফুলের মূল্য নির্ধারণপদ্ধতি

চট্টগ্রামের ফুলের দোকানগুলো নিজেরা কোনো ফুলের চাষ করে না। সব ফুল আসে ঢাকা, যশোহর, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, টাঙ্গাইল ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে। আবার কিছু কিছু ফুল ভারত ও থাইল্যান্ড থেকেও আসে। তাই ফুলের দাম সাধারণত একটু বেশি হয়ে থাকে। ফুলের মূল্য নির্ধারণে ফুলবিক্রেতারা ফুলের মৌসুমে এক ধরনের দাম নির্ধারণ করে এবং অমৌসুমে তুলনামূলকভাবে বেশি দাম নির্ধারণ করে। সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট এই সময়টা তেজি মৌসুম। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি হলো মন্দা মৌসুম। ফুলের ঝুড়ি, ফুলের তোড়া ইত্যাদির অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে ঝাউপাতা। এই ঝাউপাতা বেশি আসে যশোহর থেকে।

১ বস্তা ঝাউপাতা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকায় বিক্রি হয়। মাঠপর্যায়ের জরিপ হতে জানা যায়, গাঁদাফুল ৪৫টির ক্রয়মূল্য ৪ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ৮ থেকে ১০ টাকা, রজনীগন্ধা ১টি স্টিক ক্রয় ১ টাকা থেকে ১ টাকা ৩০ পয়সা বিক্রি ৮ থেকে ১২ টাকা, গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ১ থেকে ২ টাকা বিক্রি ৫ থেকে ১০ টাকা বা আরও বেশি, জারবারা থাইল্যান্ড থেকে আসা ক্রয় ১৫ থেকে ২৫ টাকা বিক্রি ৩০ থেকে ৫০ টাকা ইদানীং টাঙ্গাইলেও জারবারা চাষ হচ্ছে। গ্লাডিওলাস থাইল্যান্ড থেকে আসা প্রতিটি স্টিক ক্রয় ১০ থেকে ১৫ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ইদানীং গ্লাডিওলাস ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও চাষ হচ্ছে। হলুদ গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ৩ থেকে ৪ টাকা বিক্রি ৬ থেকে ১০ টাকা। সাদা গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ৪ থেকে ৫ টাকা বিক্রি ৭ থেকে ১০ টাকা, অর্কিড প্রতিটি স্টিক ক্রয় ১৮ থেকে ২৫ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেলীফুল ১টি ক্রয় ১ থেকে ১ টাকা ২০ পয়সা বিক্রি ২ থেকে ৫ টাকা, গাজরা মালা ক্রয় ৬ থেকে ৮ টাকা বিক্রি ১২ থেকে ১৫ টাকা, সিলসিলা যশোহর থেকে আসা ক্রয় ১টি গোছা ৩৫ থেকে ৪২ টাকা বিক্রি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, চন্দ্রমল্লিকা ক্রয় ১০ থেকে ১৫ টাকা বিক্রি ২০ থেকে ২৫ টাকা, গন্ধরাজ ক্রয় ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা বিক্রি ৫০ থেকে ৬০ টাকা, লিলি ক্রয় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বিক্রি ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, ডালিয়া ক্রয় ১৫ থেকে ২০ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

কনে সাজানোর ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তরা ২০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে ফুল কিনে নিয়ে যান। মধ্যবিত্তরা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকায় এবং উচ্চবিত্তরা ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে কনে সাজানোর ফুল কিনে থাকেন। গাড়ি সাজানো হয় ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে। উপহারের তোড়ার ক্ষেত্রে হাতে দেওয়ার তোড়া ১০০ থেকে ৫০০ টাকা, বড় তোড়া ৩০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। বাসরঘর সাজানোর ক্ষেত্রে

নিম্নবিত্তরা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকার মধ্যে, মধ্যবিত্তরা ৩,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকার মধ্যে এবং উচ্চবিত্তরা ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে বাসরঘর সাজিয়ে থাকেন। বিয়ের স্টেজ প্রকারভেদে সর্বনিম্ন ৩,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার মধ্যে সাজানো হয়ে থাকে। চট্টগ্রামের প্রচলিত ঘোড়ার গাড়ি সাজানো হয় ৩,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে।

ফুলের বর্তমান বিপণন ব্যবস্থা

ফুলের দোকানগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সাংগঠনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদের কোনোটির বয়স ২০ বছরের বেশী নয়, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি দোকানই মালিক সরাসরি তত্ত্বাবধান করে থাকেন। নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৭ জনের বেশী হয়। কারিগরদের প্রত্যেকেই দৈনিক বেতনভুক্ত। ফুল ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনাটি চার স্তারবিশিষ্ট। যথা: মালিক→কর্মকর্তা→ কর্মচারী→ কারিগর। প্রতিটি দোকানই দৈনিক ৮ থেকে ১৬ ঘণ্টা খোলা রাখা হয় এবং সপ্তাহের প্রতিদিনই খোলা থাকে। ফুল ব্যবসায়ে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বয়স খুবই কম, ফলে এদের ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত দুর্বল। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাই একক ধরনের, অংশীদারী মালিকানা ২/১টিতে বিদ্যমান। ফুল ব্যবসায়ে সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করে না। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় এই যে, এ ব্যবসায়ে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো বীমা ব্যবস্থা নেই। ফুল দোকানির অধিকাংশই ঐতিহ্যগতভাবে এ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তবে দু'তিনজন উদ্যমী শিক্ষিত তরুণ এ ব্যবসায়ে এসেছেন বলেও জানা যায়। দোকানের মালিকানা স্বত্ব প্রত্যেকেরই নিজস্ব, তবে ভাড়া হিসেবে গড়ে প্রত্যেককে মাসিক গড়ে ৫,০০০ টাকা করে দিতে হয়। কারো মূলধনই চার লাখ টাকার উর্ধ্বে নয়; আবার মোট মূলধনের ৩/৪ ভাগ স্থায়ী প্রকৃতির। তাছাড়া চলতি মূলধন হিসেবে প্রত্যেকেরই কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা রয়েছে। দোকানিদের অধিকাংশই (৬০%) এস.এস.সি পাশের নিচে।

বণ্টন পদ্ধতি

প্রতিটি দোকানেই কম-বেশি বিভিন্ন প্রকার ফুল ক্রেতার চাহিদানুসারে রাখা হয়। ফুল ব্যবসায়ে মধ্যস্থ কারবারীদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কমই বলা যায়। একমাত্র পাইকার ছাড়া অন্যান্যদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফল সাধারণত ঢাকা (সাভার, ধামরাই ও ঢাকার বিভিন্ন নার্সারি), যশোহরের ঝিকরগাছা এবং চট্টগ্রামের চকরিয়া ও হাটহাজারী থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ২/৩ জন পাইকার দেশের বাইরে (ভারত) থেকে রজনীগন্ধা, ফুলের চারা, বীজ, সার সংগ্রহ করে থাকে। সরবরাহ প্রাপ্তিতে নগদ ও ধার–দু'প্রক্রিয়াই বিদ্যমান। অন্যদিকে সরবরাহ ব্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন মধ্যস্থ-কারবারীদের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

বিআরটিসি বাসের ছাদে করে পরিবহন খরচ কম পড়ে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবস্থায় খরচ বেশী বলে জানা যায়। ফুল ব্যবসায়ের বণ্টন প্রণালী ছক: ১-এ দেখানো হলো।

ছক: ১

ফুল ব্যবসায়ের বণ্টন-প্রণালী

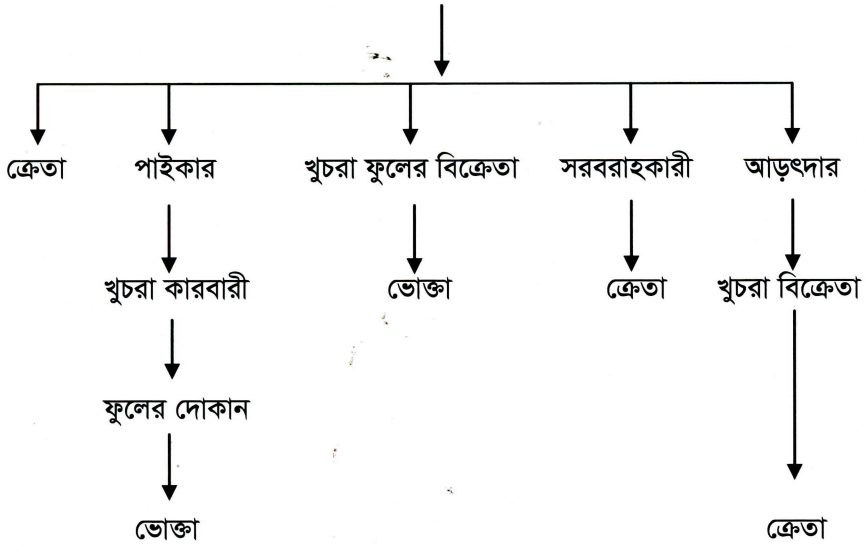

উৎস: মাঠজরিপ

ফুল উৎপাদনকারী হতে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ প্রণালীটি হলো: উৎপাদনকারী হতে পাইকার। পাইকার হতে খুচরা কারবারী। খুচরা কারবারী হতে ফুলের দোকান এবং ফুলের দোকান হতে ভোক্তা। এভাবে বিভিন্ন বণ্টন প্রণালীর মাধ্যমে ফুল ভোক্তার হতে পৌঁছে যায়।

বিপণন নীতি

খুচরা হিসেবে ফুল ব্যবসায়ীদের বিপণন নীতি হলো সংগ্রহ-ব্যয় সর্বনিম্ন রেখে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা। প্রতিটি দোকানেরই ব্যবসায়ের সময়কাল বেশী নয় বিধায় এদের সুনির্দিষ্ট কোনো বিপণন নীতি নেই। খোলা ফুলের পাশাপাশি মোড়ককৃত ফুলের বিক্রয়ও পরিলক্ষিত হয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি কৌশল হলো ফুলকে এর রং ও ছোট বড় অনুসারে সাজানোর ব্যবস্থাগ্রহণ। টাটকা ও রংযুক্ত ফুলকে আলাদা করে অধিক

মূল্য ধার্য করা হয়। ফুল বিক্রেতাদের কারোরই কোনো সুনির্দিষ্ট প্রসারনীতি নেই। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই বিক্রয়বৃদ্ধির জন্য কতিপয় কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। এ কৌশলগুলোকে ব্যক্তিকপর্যায়ের বিক্রয়ের মধ্যে ফেলা যায়। যেমন: ক্রেতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ক্রেতাকে ফুল ক্রয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং ক্রেতার পছন্দের দিকটি বিবেচনা করে মোড়ক করে দেওয়া প্রভৃতি।

তবে রোজা, চাঁদরাত (ঈদের আগের রাত), ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১লা বৈশাখ, ১লা জানুয়ারি এবং পুজোর সময়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করবার সময় দোকানদাররা বিভিন্ন ধরনের ব্যানার তৈরি করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে থাকে। ক্রেতারা যেহেতু দরকষাকষি করে থাকে, সেহেতু অধিকাংশ খুচরা দোকানে এক দামে ফুল বিক্রি হয়ে থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলোতে মান নির্ধারণ নীতি অনুসারে বড়, তরতাজা, সুন্দর ইত্যাদি আলাদা আলাদা দামে বিক্রি হয়। ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিক্রয়োত্তর সেবাপ্রদান এখনও দৃশ্যমান নয়। অন্যদিকে ফুলকে পচনশীলতা থেকে রক্ষা করারও কোনো ব্যবস্থা তেমন দেখা যায় না।

ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতাসমূহ

মাসিক ফুল ক্রয়ের হার: ভোক্তা জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ক্রেতাদের মধ্যে ৬৬%ই মহিলা এবং ৩৪% পুরুষ। আবার মাসে একবারও ফুল ক্রয় করে না এমন ক্রেতার সংখ্যা ৩১%, অন্যদিকে প্রতিমাসে ৩/৪ বার ফুল ক্রয় করে এমন ক্রেতার সংখ্যা ৩২% (সারণি: ১)। এ পর্যালোচনা থেকে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, নাগরিক জীবনের একটা বিরাট অংশ এখনো ফুল ক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সারণি:১

ক্রেতার লিঙ্গ অনুসারে মাসিক ফুল ক্রয়ের হার

লিঙ্গ/ক্রয়ের হার	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
০-০	১৫	১৬	৩১
১-২	-	২১	২১
৩-৪	১০	২২	৩২
৫-৬	৩	৩	৬
৭-৮	৪	-	৪
৯-১০	২	৪	৬
	৩৪%	৬৬%	১০০%

উৎস: মাঠজরিপ।

আয় অনুসারে ফুল ক্রয়ের হার: আয় অনুসারে ফুল ক্রয়ের হারে দেখা যায়, মাসে ৩–৪ বার ফুল ক্রয় করে এমন ক্রেতার সংখ্যা ২৭%; এর মধ্যে ১২,০০০-২০,০০০ টাকা মাসিক আয় যাদের তারাই ২১% (সারণি:২)। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, আর তা হলো সমাজের মধ্যবিত্তস্তরের নিয়মিত আয়ের লোকেরাই ফুল ক্রয়ে বেশী অভ্যস্ত।

সারণি: ২

আয় অনুসারে ফুল ক্রয়ের হার

ক্রয়ের হার আয়ের শ্রেণী	০-০	১-২	৩-৪	৫-৬	৭-৮	৯-১০	মোট
০-৪০০০	-		-	-	-	-	১
৪০০০-১২০০০	-	২	২	২	-	-	৬
১২০০০-২০০০০	৩	৭	২১	১	১	৫	৩৮
২০০০০-২৮০০০	-	৫	৪	১০	৮	৩	৩০
২৮০০০-ঊর্ধ্বে	-	১	৩	২	৭	১২	২৫
মোট	৩	১৬	২৭	১৫	১৬	২০	১০০

উৎস: মাঠজরিপ

পেশা অনুযায়ী ফুল ব্যবহারের কারণ: পেশার সঙ্গে ফুল ক্রয়ের একটি অনুকূল সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষিত এবং চাকুরিজীবিগণই বেশী ফুল ক্রয় করে থাকে। ব্যবসায়ীরা কদাচিৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ফুল ক্রয় করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা ৩৭% ফুল ক্রয় করে থাকে। তাছাড়া ২৫% চাকুরিজীবী ফুল ক্রয়ে অভ্যস্ত। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরে উচ্চবিত্ত পরিবারের ২০% গৃহিণী ফুল ক্রয় করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৫%ই ঘর সাজানোর জন্য ফুল ক্রয় করে। অন্যদিকে চাকুরিজীবীদের অধিকাংশই ঘর সাজানো ও উপহারের জন্য ফুল ক্রয় করে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, উপহার হিসাবে ৩৮% ফুলের চাহিদা বাড়ছে (সারণি: ৩)।

সারণি: ৩

পেশা অনুযায়ী ফুল ব্যবহার

ফুল ব্যবহারের কারণ/পেশা	ঘর সাজানোর জন্য %	উপহারের জন্য %	উভয়ই %	অন্যান্য %	মোট %
ছাত্র-ছাত্রী	১৫	৫	১৭	-	৩৭
চাকুরিজীবী	-	৫	১৭	৩	২৫
ব্যবসায়ী	-	৯	৪	-	১৩
গৃহিণী	-	১৪	৩	৩	২০
স্বাধীন পেশা	-	৫	-	-	৫
মোট	১৫%	৩৮%	৪১%	৬%	১০০

উৎস: মাঠজরিপ

ফুলের রং, সাইজ, সাজানোর কৌশল এবং উপস্থাপনার পার্থক্য অনুসারে ক্রয়ের পরিমাণ: ফুল ক্রয়ে বেশীর ভাগ ক্রেতাই (৯৪%) ফুলের রং, সাইজ ও সাজানোর কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এর অধিকাংশই (৫০%) খোলা ফুল ক্রয় করতে পছন্দ করে। তবে ইদানীং মোড়ককৃত ফুলের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে (সারণি: ৪)

সারণি: ৪

ফুলের রং, সাইজ, সাজানোর কৌশল এবং উপস্থাপনার পার্থক্য অনুসারে ক্রয়ের পরিমাণ

রং, সাইজ, সাজানোর ও উপস্থাপনার কৌশল	প্রভাবিত করে	প্রভাবিত করে না	মোট
খোলা ফুল	৪৪%	৬%	৫০%
প্যাকেটকৃত	৪%	-	৪%
উভয়ই	৪৬%	-	৪৬%
মোট	৯৪%	৬%	১০০

উৎস: মাঠজরিপ

ফুলের প্রকারভেদ অনুসারে ফুল ক্রয়ের পরিমাণ: ফুল ক্রেতাদের ৫০%ই রজনীগন্ধা ক্রয়ের পক্ষে, এর পরেই গোলাপের স্থান (১৪%)। তাছাড়া বেলী, চাঁপা ও মৌসুমি ফুলের চাহিদাও পরিলক্ষিত হয় (সারণি: ৫)।

সারণি: ৫

ফুলের প্রকারভেদ অনুসারে ফুল ক্রয়ের পরিমাণ

ফুলের নাম	শতকরা হার
রজনীগন্ধা	৫০%
গোলাপ	১৪%
মৌসুমি ফুল	১০%
রং যুক্ত ফুল	১০%
বেলী/চাঁপা	১০%
চামেলি/হাস্নাহেনা	২
অন্যান্য	২
মোট	১০০

উৎস: মাঠজরিপ

ফুল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থান এবং সময়: ফুল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থান এবং সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশীর ভাগ ক্রেতা অর্থাৎ ৩০% ক্রেতা সন্ধ্যায় ফুল ক্রয়ে আগ্রহী এবং ক্রেতা মনে করেন ফুল ক্রয়ে প্রতিষ্ঠিত দোকানে যাওয়াই উত্তম। আবার সময়ের স্বল্পতা হেতু অনেকেই (৪৬%) কাছের দোকান থেকে ফুল ক্রয়ে আগ্রহী (সারিণ:৬)।

সারণি: ৬

ফুল ক্রয়ের স্থান ও সময় নির্বাচন

সময়/স্থান	সকাল %	বিকাল %	সন্ধ্যা %	যে কোনো সময় %	মোট %
কাছের দোকান	৮	১২	১০	১৪	৪৬
প্রতিষ্ঠিত দোকান	৪	১০	১৬	২০	৫০
ভ্যারাইটি স্টোর	-	-	৪	-	৪
মোট	১২%	২২%	৩০%	৩৪%	১০০%

উৎস: মাঠজরিপ

ফুল ক্রয়ের জন্য আয় অনুযায়ী ব্যয়: ফুল ক্রয়ের ক্ষেত্রে নাগরিক জীবন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৭নং সারণিতে। প্রদত্ত সারণি হতে দেখা যায়, ৫০০-১,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসে ব্যয় করে এমন ক্রেতার সংখ্যা (৫৬%) সবচেয়ে বেশী। ২৮% ক্রেতা মাসে ০-৫০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করে। অন্যদিকে ফুল ক্রেতাদের ৩২% এর মাসিক আয় ৪,০০০-১২,০০০ টাকার মধ্যে।

সারণি: ৭

ফুল ক্রয়ের জন্য আয় অনুযায়ী ব্যয়

আয়ের শ্রেণী/ ব্যয়ের শ্রেণী	০-৪০০০	৪০০০-১২০০০	১২০০০-২০০০০	২০০০০-২৮০০০	২৮০০০ এর উর্ধ্বে
০-৫০০	৪	৮	৪	১২	২৮
৫০০-১০০০	২৪	২৪	৮	১২	৫৬
১০০০-১৫০০	-	-	৪	৮	১২
১৫০০ এর উর্ধ্বে	-	-	-	৪	৪
	২৮%	৩২%	১৬%	২৪%	১০০%

উৎস: মাঠজরিপ

ফুলের ভবিষ্যৎ বিপণন সম্পর্কে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি: ফুলের ভবিষ্যৎ বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাদের বিভিন্ন ধরনের মতামত লক্ষ করা যায়। ৪২% ক্রেতা মনে করে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমানে ফুলের স্থান অগ্রগণ্য; তারা মনে করে ভবিষ্যতে ফুলের বাজার প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং উত্তরোত্তর ফুলের চাহিদা বাড়বে। ২২% ক্রেতা মনে করে ফুলের ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা করা অর্জন সম্ভব (সারণি: ৮)।

সারণি: ৮

ভবিষ্যতে ফুল বিপণন সম্পর্কে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি

মতামত	শতকরা হার
চাহিদা বৃদ্ধি পাবে	২০%
জীবিকা হিসেবে এ ব্যবসায় অগ্রগণ্য	১২%
প্রতিযোগিতা বাড়বে	৪২%
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব	২২%
মতামত নেই	৪%
মোট	**১০০%**

উৎস: মাঠজরিপ

তাছাড়া উক্ত জরিপে আরও কতকগুলো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছিল–যেমন, ফুল ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য সরকারের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে কি? এক্ষেত্রে

অনেকেই মনে করে, ফুল ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। তাছাড়া মূল্যব্যবস্থা এবং দোকানের সংখ্যা পর্যাপ্ত কি-না– সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জানা যায়, চট্টগ্রাম শহরে ফুলের কোনো একক দর ব্যবস্থা নেই, ফলে অনেক সময়ই ক্রেতাকে দর কষাকষি করতে হয় এবং দোকানের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিৎ বলে তারা মনে করে।

ফুল ব্যবসায়ের উন্নয়নে করণীয়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপ্লব ঘটাতে হবে কৃষি ক্ষেত্র থেকেই। যেহেতু আমাদের দেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাই কৃষিভিত্তিক শিল্প আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আর তাই সরকারিভাবে ফুল গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে তার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে ফুলচাষ। এতে করে কৃষকরা লাভবান হবে। কারণ ধান, গম, পাট ইত্যাদি ফসল চাষের চেয়ে ফুলচাষ অনেক বেশি লাভজনক। জমিতে প্রচলিত ফসল চাষ না করে ফুলচাষ করে ৫ থেকে ৬ গুণ বেশী আয় করা যায় (আজম ১৯৯৯)। তাই কালবিলম্ব না করে ফুল গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে সেখানে রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, বড় আকারের গাঁদা, অর্কিড, গ্লাডিওলাস প্রভৃতি ফুলের জাত বিদেশ থেকে আমদানি করে পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে এসব ফুল আমাদের দেশে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের ৬ মাসে বাংলাদেশ ১ কোটি ৭৩ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার (১২১ কোটি ৩১ লাখ টাকা) মূল্যমানের ফুল ও ফুলের তোড়া রপ্তানি করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.২০% বেশি (মাহমুদ ২০১১)। মিউটেশন ব্রিডিং এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে ফুলের জাত, রং ও গন্ধের উন্নয়ন ঘটাতে হবে; ফুল রপ্তানির ক্ষেত্রে দ্রুত শিপমেন্টের নিশ্চয়তাসহ দ্রুত কার্গো বিমানের ব্যবস্থা করতে হবে; জাতীয় পুষ্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে দেশি ফুল রপ্তানিকারকদের যোগাযোগ ঘটাতে হবে; ফুল রপ্তানির ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করতে হবে; প্রয়োজনে সাবসিডি এবং সিংহভাগ ঋণ মঞ্জুর করাসহ যাবতীয় সুবিধা প্রদান করতে হবে; মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, জার্মান, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের আরও যেসব দেশে ফুলের চাহিদা রয়েছে সেসব দেশে আমাদের ফুল বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে; ফুল রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে; ফুল রপ্তানিকে কেন্দ্র করেই আরও কিছু সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে; যেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে লাভবান হবে গ্রামের অবহেলিত কৃষককুল। চাঙ্গা হবে গ্রামীণ অর্থনীতি। কৃষিখাতে যে ছদ্ম বেকারত্ব, মৌসুমি বেকারত্ব আছে, তাও আশা করা যায় ঘুচে

যাবে। দেশ হবে সমৃদ্ধিশালী। তাই আর অবহেলা নয়, জাতীয় স্বার্থে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এ খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

এছাড়া আমাদের দেশে ফুলচাষ বৃদ্ধি করতে হলে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে: ফুল চাষসম্পর্কিত কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ফুল কর্তন, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও পরিবহনের বিষয়ে এবং বাজারজাতকরণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা; আগ্রহী শিক্ষিত বেকার যুবকদের ফুলচাষে উৎসাহ দেওয়া; ফুলচাষি ও ফুল বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা; ফুলের বীজ, কাটিং সরবরাহ নিশ্চিত করা; বিদেশ থেকে অবৈধভাবে ফুল আমদানি বন্ধ করা; এবং বিদেশে ফুল রপ্তানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ।

ফুল থেকে ফুলজাত সুগন্ধি ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরির জন্য শিল্প গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ ও সার্বিকভাবে ফুলের উপর গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি ফুল উৎপাদন ও ব্যবহার চর্চার জন্য কোনো দিবস/সপ্তাহ পালনের সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফুলচাষিদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সরকারের জরুরিভিত্তিতে ঢাকায় একটি ফুলের নিলাম বাজার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ বাজারে ফুলবিক্রি করে ফুলচাষিরা ন্যায্য দাম পাবেন। বর্ষা ও শীত মৌসুমে যে ফুল উৎপাদিত হয়, তার ক্রেতা দেশে নেই। চাহিদার তুলনায় বেশী ফুল উৎপাদিত হওয়ায় ফুল নষ্ট হয় কিংবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ সময় ফুল বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা করা হলে চাষিরা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবেন।

নব্বই দশকের শুরুর দিকে ফুল রপ্তানি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়, আর ১৯৯১ সালে শুরু হয় রপ্তানি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যথাযথ ব্যবস্থা নিলে জাপান, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হংকং, সুইজারল্যান্ড, কোরিয়া, গ্রীস, সুইডেন, কুয়েত প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশি ফুলের বাজার তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশে ফুলচাষি কল্যাণ সমিতি গড়ে ওঠে ১৯৯৫ সালে। সমিতির প্রথম দাবি, উৎপাদিত ফুল নষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে সরকারি উদ্যোগে রপ্তানির ব্যবস্থা করা। এজন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা, ফুলের নিলাম বাজার স্থাপন করে ন্যায্যমূল্যে নিশ্চিত করা। কৃষিবিভাগ থেকে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, সরকারিভাবে গ্রীন হাউস প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ভারত প্রতিবছর আড়াই হাজার কোটি রুপি মূল্যের ফুল বিদেশে রপ্তানি করে (আলম ১৯৯৯)। বাংলাদেশে থেকেও ফুল রপ্তানি করে কোটি কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। ফুলচাষিরা অন্যান্য কৃষিপণ্যের মতো ফুল সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় হিমাগার স্থাপনের দাবি জানান।

উপসংহার

এ দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমির মাটি ফুলচাষের জন্য উপযোগী। এ দেশের মৌসুমি আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, ফুল চাষের অনুকূল। এখন শুধু প্রয়োজন

ফুলের উন্নত জাত, সুষ্ঠু উৎপাদন কৌশল এবং সঠিক নির্দেশনা। আর এজন্য সর্বাগ্রে দরকার ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রমের। ফুল গবেষণার সরকারি উদ্যোগ, অনুদান, প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে ফুলের উপর কোনো গবেষণা হয়নি। তবে আশাব্যঞ্জক তথ্য এই যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিছু তরুণ বিজ্ঞানী স্ব-উদ্যোগে এ গবেষণায় এগিয়ে এসেছেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি বিশাল শেড হাউজে বিগত ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাস থেকে দু'একর জমির ওপর পুষ্প গবেষণার কাজ চলছে। Ornamental Landscape and Flori-culture Division (OLFD) নামের একটি স্বতন্ত্র বিভাগও খোলা হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানা যায়, একটু চেষ্টা করলেই উন্নত জাতের রপ্তানিযোগ্য ফুল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং রপ্তানি কৌশলের বিজ্ঞানভিত্তিক প্যাকেজ উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমরাও বিশ্ব ফুলের বাজারে পৃথিবীর অন্যান্য ফুল রপ্তানিকারক দেশগুলোর পাশে সহজেই স্থান করে নিতে পারি। আর এ লক্ষ্য নিয়েই OLFD এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের একমাত্র পুষ্প গবেষণা কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে। বাজারে লাল রঙের গ্লাডিওলাস দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। অথচ গবেষণা কেন্দ্র মিউটেশন ব্রিডিং (Mutation Breading) প্রক্রিয়ায় নানা রঙের চটকদার গ্লাডিওলাস উৎপন্ন করেছে। যেমন: জারসি, কমলা, সাদা, নীল, নানা বাহারি রঙে। টকটকে লাল সিলভিয়া পাচ্ছে হলুদ এবং সাদা রং। শেড হাউজে আছে হরেক রকম চন্দ্রমল্লিকা, অর্কিড, বিশাল সাইজের গাঁদা, ব্লাকরোজ ইত্যাদি। এগুলোর ভালো জাত বিদেশ থেকে এনে দেশের আবহাওয়া উপযোগী করে Induction প্রক্রিয়ায় Release দেওয়া যাবে। এটাকে একটি আশাব্যঞ্জক গবেষণা বলা যায়।

বর্তমান বিশ্বে টিস্যু কালচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং লাভজনক ব্যবসা। ১৯৯৯ সালে এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ১১৫টি ল্যাবরেটরিতে মোট ৬৮০ মিলিয়ন উদ্ভিদ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদনের চার ভাগের তিন ভাগই ফুলের চারা উৎপাদনে বাণিজ্যিকভাবে নিয়োজিত। (আরা ১৯৯৯)। ১৯৯৪ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ফুল রপ্তানি করে প্রতিবছর থাইল্যান্ড ৮ মিলিয়ন ডলার এবং হল্যান্ড ১৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে। বাংলাদেশে সাধারণত শীতকালীন গোলাপ, গ্লাডিওলাস, কার্নেশন, চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়া ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানির জন্য উপযোগী। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বায়োটেকনোলজি বিভাগ উল্লিখিত ফুলগুলোর চারা টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের প্রযুক্তি বের করেছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে বাণিজ্যিকভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ফুলের চারা উৎপাদনে নিয়োজিত আছে ক্রিসেন্ট বায়োটেকনোলজি, প্লান্টটেক লিমিটেড, নিউ ইস্কাটন, রেনটিক, ব্রাক এবং আই আই

আর ডি। আমাদের দেশে এ প্রযুক্তি সার্বিকভাবে প্রয়োগ করে ব্যাপক চারা এবং ফুল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ফুল সরবরাহ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের ফুলের চাহিদা মিটিয়ে ফুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেছেন। ফুলের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ব্যাপারে দীর্ঘদিন কাজ করছে হার্টেক্স ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে শৌখিন গাছ ও বিভিন্ন জাতের অর্কিড পাঠিয়েছে। তাছাড়া নেদারল্যান্ডস-এর আল্পাসমেয়ারে যে বিরাট ফুলের বাজার রয়েছে সেখানে রজনীগন্ধা ফুল পাঠানো হয়েছিল। ফুলের গুণাগুণ যাচাই করে তারা যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে সেখানে রজনীগন্ধার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে (আমিন ২০০৩)। বাংলাদেশ থেকে আরো যে ফুল বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গোলাপ, ক্যাকটাস, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ডায়ানথাস, ক্যালেনডুলা, গ্ল্যাডিওলাস প্রভৃতি। শীতপ্রধান দেশে এবং মরুময় উষ্ণ– এ দু'ধরনের দেশেই শৌখিন গাছের চাহিদা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসব গাছের বাজার হতে পারে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্নাটক, অন্ধপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের ৩৪ হাজার হেক্টর জমি ফুল চাষের আওতায় এনে সংশ্লিষ্টরা বছরে ৫শ কোটি টাকার ফুল রপ্তানি করছে। হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইসরাইল, কলাম্বিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, থাইল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশ ফুল রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রায় দু'শ বিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে। সুতরাং এ খাতটিকে উপেক্ষা না করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করলে রপ্তানি আয়ের একটা বড় অংশ আমরা ফুল রপ্তানি থেকে আয় করতে পারব। এখন শুধু প্রয়োজন সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে ফুলের চাষাবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করা। ফুলকে রপ্তানিমুখী পণ্যে পরিণত করতে যেসব অন্তরায় ও সমস্যা বিদ্যমান, অবিলম্বে তার নিরসন প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিজ্ঞান, আর্থিক সহযোগিতা ও রপ্তানিপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের নিরসন হলে অনায়াসে দেশীয় ফুল একটা উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যে পরিণত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।

তথ্য নির্দেশ:

হোসাইন, মোঃ জাকির (১৯৯৩): "ঢাকা শহরে ফুল বিপণন: একটি সমীক্ষা", দি রাজশাহী ইউনিভারসিটি স্টাডিজ, পার্ট-সি, ভলিউম-১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

নন্দী, সুব্রত (১৯৯৮): "বাংলাদেশে ফুল রপ্তানির সমস্যা ও সম্ভাবনা", কৃষিকথা, ৫৮ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগষ্ট।

বাকী, আব্দুল্লাহেল (১৯৯৯): "বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা", কৃষিকথা, ৫৯ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল–মে।

বিশেষ প্রতিবেদন (২০০২): "বাংলাদেশে পুষ্প বাণিজ্য", দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ই মার্চ, পৃষ্ঠা: ১৩।

বিশেষ প্রতিবেদন (১৯৯১): "কচড়া, ফুল নেবে গো", দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি।

কামাল, মোস্তফা (১৯৯৫): "ঢাকায় তাজা ফুলের কদর বাড়ছে", রোববার, ৬ আগস্ট।

রেহমান, শফিক (২০০১): "বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ৪০ প্রকার ফুল চাষ হচ্ছে", দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ নভেম্বর।

চৌধুরী, যীশু রায় (২০০১): "প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম; বিকিকিনি বাজারে ফুল", প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল।

পারমিতা, প্রজ্ঞা (২০০২): "ফুলের জয় সর্বত্র", দৈনিক পূর্বকোণ, ১৮ মে।

মুরাদ, ওয়াহিদ (২০০১): "ফুল চাষে ঋণ", দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ জুলাই।

আলম, ফখরে (১৯৯৯): "ফুল যখন কৃষিপণ্য", ভোরের কাগজ, ২০ নভেম্বর।

আমিন, শামীম আল (২০০৩): "হতে পারেন ফুলের চাষী", প্রথম আলো, ২৯ জুলাই।

আজম, সৈয়দ শফিউল (১৯৯৯): "ফুল রপ্তানি করে বছরে কয়েক'শ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব", দৈনিক পূর্বকোণ, ৩ জুলাই।

রিফেল, শামসুল করিম (২০০০): "চট্টগ্রামে ফুলের ব্যবসা", দৈনিক পূর্বকোণ, ১৮ সেপ্টেম্বর।

হক, এনামুল (২০০১): "আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফুলের বাণিজ্য", দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মার্চ।

আরা, কবিতা আনজু-মান (১৯৯৯): "বাংলাদেশে ফুল চাষ: প্রয়োজন অর্থনৈতিক বিবেচনা", সংবাদ, ১৬ নভেম্বর।

মাহমুদ, রাসেল (২০১১): ফুল চাষ, "রপ্তানির মাধ্যমে আয় হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা", দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারি।

কুদ্দুস, আব্দুল (২০১১): "গোলাপের গ্রাম বরইতলী", প্রথম আলো, ১ মার্চ।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৩): বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১, ৩, ৬।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

শমসের গাজী (১৭০৬-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ): মধ্যযুগের এক কিংবদন্তী শাসক

*এ, কে, এম, আবদুল আউয়াল মজুমদার**

শমসের গাজী মধ্যযুগের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসক। তাঁকে নিয়ে রচিত প্রায় চুয়ান্নটি গ্রন্থ/স্মরণিকা/পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি "শমসের গাজী" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। "বাংলাপিডিয়া"র ৯ম খণ্ডের ২৫৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ভারতে তাঁর উপর অনেক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. রমেন্দ্র বর্মণ "গাজীনামা" নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থটির সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ফলে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়।

গাজীর বীরত্বগাথা, পুঁথি, কবিতা, প্রবচন, জারি-সারি গান এক সময় ফেনী, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। আজো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এগুলো প্রচলিত রয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে গাজীর পালা, গাজীর গীত ও গাজীর পুঁথি পাঠ ছিল অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিচর্চা। ছোট শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য দাদা-দাদী, নানা-নানী তাদেরকে শুনাতেন গাজীর বীরত্বগাথা ও অবিশ্বাস্য কেচ্ছাকাহিনী। ভারতের ঘরে ঘরে এখনো শিশুদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গাজীর বীরত্বগাথা শুনানো হয়। অথচ এখন বাংলাদেশে আমরা এ বীর শাসক সম্পর্কে অতিসামান্যই জানি ও আলোচনা করি। তিনি আমাদের কাছে অনেকটাই বিস্মৃত। এমন একজন কিংবদন্তী শাসকের হারিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়।

শমসের গাজীর পরিচয়

প্রকৃত নাম শামসের আলী। শাসনকালে দরবারে প্রচলিত নাম শ্রী শ্রীযুত মাহাম্মদ শমসের চৌধুরী জমিদার। পিতার নাম পীরবক্স মোহাম্মদ। মাতার নাম কৈয়্যারা বিবি। জন্ম ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান- বর্তমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণশিক পরগনার নিজকুঞ্জুরা গ্রাম। এ গ্রামটি ছাগলনাইয়া উপজেলার ঘোপাল

*রেক্টর, বিপিএটিসি এবং শমসের গাজী বিষয়ক গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ 'শেকড় লতাপাতা ও ঠিকানা'

ইউনিয়ন-এর অন্তর্গত। আদি পৈত্রিকনিবাস নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার ওমরাবাদ পরগনার কচুয়া গ্রাম। শমসের গাজীর পিতা পীরবক্স মোহাম্মদ ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কচুয়া থেকে নিজকুঞ্জুরায় আগমন করেন।

পীরবক্স মোহাম্মদ-এর পরিবার ওমরাবাদের তালুকদার ছিলেন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডব এবং নানাবিধ কারণে পীরবক্স মোহাম্মদ ধন-সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় তিনি ওমরাবাদ থেকে নিজকুঞ্জুরায় পাড়ি জমান। এখানে তিনি বাজার সরকারের চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি জমিদার নাছির মোহাম্মদ-এর একজন কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে যে, পরবর্তীকালে পীরবক্স মোহাম্মদ-এর নামেই বর্তমান পরশুরাম উপজেলার একটি বাজারের নাম হয় "পীরবক্স মুন্সীর হাট"। তালুকদারি-জমিদারির কর্মাধ্যক্ষদেরকে "মুন্সি" নামেও ডাকা হতো। পীরবক্স মোহাম্মদ একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

শমসের গাজীর জন্মের অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তিনি নিঃসন্তান হিন্দু তালুকদার জগন্নাথ সেন ও তদীয় স্ত্রী সোনা দেবীর পালকপুত্র হিসেবে লালিত-পালিত হন। শিশুকাল থেকেই শমসের গাজী ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তাঁর মেধাশক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি ছিলেন স্কুলের সেরা ছাত্র। একই স্কুলে জমিদার নাছির মোহাম্মদ চৌধুরীর পুত্ররাও অধ্যয়ন করত। কিন্তু তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে শমসের গাজীর সঙ্গে পেরে উঠত না। শমসের-এর মেধাশক্তি সম্পর্কে কৈলাসচন্দ্র সিংহ উল্লেখ করেছেন, "অল্পকালেই শমসের বিদ্যাবলে ও বাহুবলে জমিদার পুত্রগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইলেন।"[১] বাল্যকালেই তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ঐ বয়সেই তিনি গড়গড় করে বলতে পারতেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, সুর দিয়ে গাইতে পারতেন ফারসি কবি রুমী, খৈয়াম ও হাফিজের শের।

শুধুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধিতেই নয়, তিনি দুরন্তপনা, সাহসিকতা ও শারীরিক শক্তিতেও ছিলেন বলীয়ান। বাল্যকালেই অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। কুস্তি খেলায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বহু বীরত্বপূর্ণ ও অবিশ্বাস্য দুরন্তপনা লোকজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। তিনি তালুকদার জগন্নাথ সেন-এর কাছে তালুকদারি পরিচালনার তালিমও গ্রহণ করেন। শমসের-এর পালক পিতা জগন্নাথ সেন-এর মৃত্যুর পর তিনি কঙ্গুরার (শুভপুর) তালুকদার হন। ১৭৩৯ থেকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কঙ্গুরার তালুকদার ছিলেন। এ তালুকদারির কাছারি ছিল চম্পকনগরে। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণশিক-এর জমিদারি গ্রহণ করেন। ১৭৪৫

১ "রাজমালা" লেখক–শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণশিক-এর জমিদার ছিলেন। মেধা, সাহস, শক্তি, ন্যায়বিচার ও বীরত্বের কারণে তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

শমসের-এর স্বপ্ন ছিল বাংলার ভাটি অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর অসীম সাহস, শারীরিক শক্তি এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে সাধারণ জনগণ তাঁকে পছন্দ করতেন। তারা শমসের-এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। শমসের জনতার সহায়তা নিয়ে এক বিরাট লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর সহায়তায় তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। বিপ্লবী জমিদার হিসেবে চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার বিশাল অংশ তাঁর শাসনাধীনে আসে। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, ত্রিপুরার অধিকাংশ অঞ্চল, সিলেটের কিয়দংশ এবং উত্তর চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকার এক মহাপ্রতাপশালী শাসক ছিলেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মুর্শিদাবাদের নবাব মীর কাসেম আলী এবং ত্রিপুরার মহারাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে তাঁর শাসন এবং একইসঙ্গে জীবনাবসান ঘটে।

শমসের গাজীর পরাজিত ও নিহত হওয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হন। অতঃপর প্রথমে তাঁকে ঢাকায় এবং পরে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিশেষে বর্তমান দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে এনে তোপের মুখে তাঁকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য, ঘোড়াঘাটে তখন মুর্শিদাবাদের নবাবদের একটি দুর্গ ছিল। অপর একদল ঐতিহাসিকের মতে, একজন সাধুর মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের নবাব কৌশলে তাঁকে নবাবের প্রাসাদে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁকে স্বীয় প্রাসাদ থেকে বন্দি করে নিয়ে ঘোড়াঘাটে হত্যা করা হয়। তাঁর রাজধানী ও প্রাসাদ ছিল বর্তমান ছাগলনাইয়া উপজেলার জগন্নাথ-সোনাপুর গ্রামে। তাঁর পরাজয়ের পর প্রতিপক্ষরা তোপ দিয়ে তাঁর প্রাসাদ ও রাজধানী নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। সেখানে বর্তমানে একটি কেল্লার প্রবেশমুখের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এলাকাটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

গাজীর রাজত্বকালে জগন্নাথ-সোনাপুরে স্থাপিত রাজধানী ও বিশাল প্রাসাদ সম্পর্কে "গাজীনামা"য় উল্লেখ রয়েছে যে:

"দক্ষিণেতে ফেনী নন্দি, পূর্বে গিরি
মুড়াবন্দি উত্তরেত এহেন জলদি।।

পশ্চিমে ময়লা পানি তার মধ্যে ভদ্রাখানি, মধ্যে যেন খিরুদের দধি।।"

প্রতিপক্ষরা গাজীর প্রাসাদ ও রাজধানী উড়িয়ে দিলেও সেখানে তাঁর শাসন আমলের কিছু স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়ে গেছে। আজ থেকে প্রায় ২৬০ বছর আগে ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও ফুলগাজী এলাকায় গাজীর খননকৃত কৈয়্যারা দিঘী, তনু বিবির দিঘী, আটাই দিঘী, বল্লভপুরের আলীয়া গাজীর দিঘী, পূর্ব ছাগলনাইয়ার দেওয়ান আবদুর রাজ্জাকের দিঘী, দেওয়ান বাটির দিঘী, মনু বিবির দিঘী, জগন্নাথ মন্দির ও মূর্তি, কাটাগঙ্গা ও মরাগঙ্গা এবং ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুরে এখনও গাজীর দরগা তাঁর শাসন আমলের কীর্তি বহন করে চলেছে। ফেনীর আদিনাম শমসেরনগর। অনুমান করা হয় এটিও শমসের গাজীর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ইতিহাসে শমসের গাজী

'গাজী' শব্দের অর্থ বিজয়ী বীরযোদ্ধা। যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বপ্রদর্শন ও জয়লাভের কারণে জনসাধারণ তাঁর নামের সঙ্গে "গাজী" শব্দটি জুড়ে দেন। জনগণের নিকট তাঁর বড় পরিচয় ছিল গাজী। তিনি ছিলেন প্রজাসাধারণের নিকট কিংবদন্তীর মতো।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক শমসের গাজীর শৌর্য-বীর্য ও গৌরবময় কীর্তি তুলে ধরতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর কতিপয় উপাধি হচ্ছে- ভাটির বাঘ, বীরকেশরী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী, বীর সিপাহসালার, বিপ্লবী জমিদার, মুকুটহীন রাজা, প্রজারঞ্জক শাসক, প্রজাবান্ধব শাসক, জনহিতৈষী শাসক, দানবীর, গরিবের রাজা, সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী শাসক, বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শনকারী শাসক ও সেনানায়ক ও দামি নবাব ইত্যাদি।

গাজী সম্পর্কে কয়েকজন ইতিহাসবিদ, গবেষক ও লেখকের উক্তি নিচে তুলে ধরা হলো:

১. "কুমিল্লা জেলার ইতিহাস" (১৯৮৪) গ্রন্থের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস/মধ্যযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশে লেখক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া[২] উল্লেখ করেন (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯):

"শমসের গাজী নামক এক ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। চাকলা রওশনাবাদসহ এক বিরাট এলাকা তাঁর শাসনাধীন ছিল। তিনি একজন দক্ষ, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ভূম্যধিকারী ছিলেন।"

---

[২] প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর (১৯৬৮), অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (১৯৭৬) গবেষক, শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক, সমালোচক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক।

২. ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ "রাজমালা" গ্রন্থে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬):
"শমসের গাজী প্রকৃতপক্ষে দাতা ছিলেন।"

৩. ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবী ও লেখক বাবু ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী বলেন:
"বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শনের পর এইরূপ একটি বিস্ময়কর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।"

৪. অমলেন্দু দে[৩] সম্পাদিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা" বা ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থের ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এক সময়ে শমসের গাজী নামে এক ব্যক্তি ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থান দখল করে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। একখণ্ড হাতে লেখা "জীবন চরিত্র" কৈলাস চন্দ্র সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন।"

৫. "নোয়াখালী জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক কাজী মোজাম্মেল হক[৪] লিখেছেন:

"তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা এবং বীরকেশরী। সমকালীন রাজন্যবর্গ তাঁর বীরবাহুর নিকট সদর্পে টিকতে পারেন নি। শমসের গাজীর প্রতিভা এবং অপরিমেয় শক্তি ও সাহস মারাঠা বীর শিবাজী অথবা শের শাহের বীরত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তিনি ছিলেন ভাটির বাঘ- এক বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি।"

৬. ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত "গাজীনামা"-র সম্পাদক ড. রমেন্দ্র বর্মণ লেখক ও গবেষক বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে:

"শমসের গাজীর কৃষক আন্দোলন ও গেরিলা রণকৌশল আবহমানকালের প্রাকৃতজনের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের রণকৌশল। মাও-সে-তুঙ, চে গুয়েভারা, মারিঘেলা অথবা অন্য কেউ এই রণকৌশল উদ্ভাবন করেন নি। তারা শুধুমাত্র কৌশলকে উন্নত ও ফলপ্রদ করেছেন।" এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি শমসের গাজীকে মাও-সে-তুঙ ও চে গুয়েভারার কাতারভুক্ত করেছেন।

৭. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন:

"শমসের গাজী ভাটি বাঙ্গালার দামি নবাব হইয়াছিলেন। তাহার চমকপ্রদ ইতিহাস রবিনহুডের গল্পের মত চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক।"

---

৩ ভারতীয় ইতিহাসের গুরুনানক অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

৪ অবসরপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা। বর্তমানে ফেনী শহরে বসবাসরত।

৮. দীনেশচন্দ্র সেন তার "The Folk Literature of Bengal" গ্রন্থে গাজীকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি গাজীর নামের আগে বার বার 'দি' বসিয়ে গাজীকে "দি শমসের গাজী" নামে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি গাজীর বীরত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

৯. শমসের গাজীর বংশধর আলহাজ্ব সফর আলী[৫] এর (১৮৯২-১৯৬৯) বর্ণনায়:

"শমসের গাজী ছিলেন এক মহাশক্তিশালী যোদ্ধা ও শাসক। শত্রুবাহিনী তাঁর নিকট বার বার পরাজিত হয়েছে। কোনভাবেই টিকতে না পেরে অবশেষে জাদু করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। অতঃপর হত্যা করে। শত্রুরা তাঁর বংশধরদের ওপর চালায় অশেষ নির্যাতন। জীবন বাঁচাতে বংশধরেরা নানা অজানা স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ও দুরবস্থায় পড়ে।"

গাজীর শাসনাধীন এলাকাগুলো ছিল:

১।	খণ্ডল (ফেনী)	১১।	পার্টিকরা (কুমিল্লা)
২।	জগৎপুর (ফেনী)	১২।	বলদাখাল (কুমিল্লা)
৩।	দক্ষিণশিক (ফেনী)	১৩।	কদবা (কুমিল্লা)
৪।	আরামরাবাদ (ফেনী)	১৪।	নূরনগর (কুমিল্লা)
৫।	তিষ্ণা (চৌদ্দগ্রাম)	১৫।	গঙ্গামণ্ডল (কুমিল্লা)
৬।	চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)	১৬।	বিশ্যলগড় (সিলেট)
৭।	খাঞ্ছানগর (কুমিল্লা)	১৭।	আটজঙ্গল (সিলেট)
৮।	মেহেরকুল (কুমিল্লা)	১৮।	ভাটিদেশ ও শ্রীহট্ট
৯।	বগাসাইর (কুমিল্লা)	১৯।	সরাইল (কুমিল্লা)
১০।	জামিরখানি	২০।	বরদাঘাত

গাজীর শাসনব্যবস্থা

গাজীর শাসন ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে শেখ মনোহর রচিত "গাজীনামা" এবং ত্রিপুরার "রাজমালা", "কৃষ্ণমালা", "চম্পক বিজয়" প্রভৃতি গন্থে উল্লেখ রয়েছে। গাজীনামা পুঁথি আকারে একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালীর সেরেস্তাদার মৌলভী লুৎফুল খবীর এটি মুদ্রিত করেন। গ্রন্থটি কলের ছাপায় কোলকাতা থেকে মুদ্রণ করা হয়। এর কপি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। এর সর্বশেষ কপি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ "তিন হাজার বছরের নোয়াখালী" গ্রন্থের লেখক কাজী মোজোম্মেল হক চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার মঘধরা গ্রামের জনৈক

[৫] একজন ন্যায়পরায়ণ, বিদগ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। নিবাস-বাসণ্ডা (রায়কোট ইউনিয়ন), লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

আব্দুল বাতেন-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অনুরোধক্রমে বৃদ্ধ আব্দুল বাতেন জীর্ণ-শীর্ণ কপিটি কাজী মোজাম্মেল হককে দান করেন। এ কপিটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজী মোজাম্মেল হক-এর হেফাজতে ছিল। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরের জনৈক অ্যাডভোকেট এ গ্রন্থটি ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ধার নেন। কিন্তু পরে আর ফেরৎ দেননি। ফলে মৌলভী লুৎফুল খবীরের গ্রন্থটিও এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে হস্তলিখিত মূল গাজীনামার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরার গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. রমেন্দ্র বর্মণ একটি গাজীনামা সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থটি আগরতলার বিভিন্ন বুক স্টলে পাওয়া যায়।

কবি শেখ মনোহর রচিত মূল "গাজীনামা"য় মোট ৪,০০০ চরণ বা শ্লোক ছিল। এটি নবাব শমসের গাজীর মূল জীবনীগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। "গাজীনামা" সম্পর্কে এক প্রাচীন কবি লিখেছেন:

"শেখ মনোহর কহে পঞ্চগলি সরস।
গাজীর নামা পুস্তক হেন মধুরস।"

ড. রমেন্দ্র বর্মণ লিখেছেন: "গাজীনামা" এক অপূর্ব কাব্য, এক ঐতিহাসিক দলিল। শমসের গাজীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার শ্রমস্বেদজীবী কৃষকদের উত্থান ও জাগরণকে আমীর নন্দন শেখ মনোহর কাহিনী কাব্যে রূপায়িত করেন, যা কাব্য গুণে না হোক, বিষয় মহিমায় একথা নিশ্চিত, শমসের গাজীর কথা অপূর্ব।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত, দক্ষ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক। তিনি নতুন এক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর শাসন এলাকাকে পরগনা, থানা ও তহসিল-এ তিনভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর বহরে প্রায় পনের হাজার সৈন্য ছিল। তিনি প্রতি তহশিলে একশ জন সিপাহি এবং দু'জন মুহুরি নিযুক্ত করেন। বিচারব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সর্বোপরি তিনি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রজাসাধারণকে সুবিচার দেওয়া নিশ্চিত করেন। তিনি ৮২ সিক্কা ওজনে সের ধার্য করে নতুন বাজারব্যবস্থা চালু করেন। প্রতিবাজারে বাজার দর তালিকা লটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। কঠোরভাবে এ তালিকা অনুসরণে সকলকে বাধ্য করেন। কেউ অন্যথা করলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।

"গাজীনামা"র ভাষায়:

"হাট বাজারে গাজি মনাদি ফেরাই।
উজন করিয়া দিল নিরেক লিখাই।।
হাটে বাজারে জথ বিরাসি ওজন।
তার পাচ্ছে কহি সুন নিরেক পতন।

সেক চালি পণপণ ধান্য কাঠারাম পীতা।
মরিছ ছএ কুড়ি গোড় দুই পণ ব্রতা।।
লবনের সের নেএ পণপণ বিক্রি করা।
রসুন পেয়াজ দিগ বনে গন্ডাধরা।।
কাপাসের মূল্য মাত্র পরিপণ ধার।
কলই ছএ কুমড়মাত্র মসুর দোগন পার।।
বাটলা মটল কেলই মূল্য বরাবর।
মুগ আর অড়লের পরিপণ সার।।
তৈল মুসের বারপণ ঘৃত চারিআনা।
গাজি এ করিয়া দিলা এইসব কার্খানা।।
মধুমূল্য দুই আনা তিল তিসি য়ানা য়ানা।
সৈশ্ব কেরন তিন পণ কাছ রাম দানা।।
এহা হোতে বেধকস করিতে না পারে।
অসুদ্দ না চলে কেহ গাজির যে ডরে।।"

শমসের গাজীর শাসন আমলের (১৭৪৫-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) কয়েকটি পণ্যের মূল্য:

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য
১.	চাউল	প্রতি সের	এক পয়সা
২.	লংকা	”	”
৩.	গুড়	”	দু’ পয়সা
৪.	লবণ	”	”
৫.	পেঁয়াজ-রসুন	”	”
৬.	ডাল	”	”
৭.	মুগ ডাল	”	”
৮.	ঘৃত	”	চার আনা
৯.	সরিষার তেল	”	তিন আনা
১০.	মটর	”	দু’ পয়সা
১১.	অড়হর	”	এক আনা
১২.	কার্পাস তুলা	”	এক পয়সা

অসাম্প্রদায়িক শমসের গাজী

শমসের গাজী ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ও শাসক। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু-মুসলিম প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। তিনি অনেক হিন্দুকে রাজকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনকার্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে

হরিহর দেওয়ান, গঙ্গা গোবিন্দ, কানুরাম লস্কর, হরিশচন্দ্র প্রমুখ হিন্দুগণ নিয়োজিত ছিলেন। গঙ্গা গোবিন্দ ছিলেন তাঁর "প্রধান দেওয়ান" এবং হরিহর ছিলেন "নায়েব দেওয়ান"। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী হিন্দুপরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

সুশাসক ও ন্যায়পরায়ণ গাজী

গাজী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক। তাঁর শাসনামলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদেনি। তিনি প্রজাকুলের মঙ্গলসাধনে অতিশয় যত্নবান ছিলেন। তাঁর শাসনের মৌলিক নীতি ছিল "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন"। তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদেরকে কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর শাসন এলাকায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর শাসন আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। এপ্রসঙ্গে "গাজীনামা"র বর্ণনা:

"হক বিচার করে গাজী বেহক ভেজিয়া।
গাজীকে বাখানে সবে জগত ভরিয়া।।
ভাগ্যকর্তা শমসের গাজী মানে সর্বজনে।
পানির কুম্ভির বনের ব্যাঘ্রে সবে দোহাই মানে।"

গাজীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে "গাজীনামা"য় আরও উল্লেখ রয়েছে যে:

"হেনমতে করে গাজী মুল্যু করে কাম।
সদেষে বিদেষে ঘোষে গাজীর খোষ নাম।।
ডাকাইত পাইল তাকে তুলিদেন্দ খ্রিস্টাব্দে
চোর পাইলে হস্ত কাট ও তৎকালে।।
পরদারা হবে যেবা মারে বেত বারি।
জেন মজা তেন সাজা গাজী করে ভারি।।"

শিক্ষানুরাগী শমসের গাজী

তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী শাসক। তিনি তাঁর প্রাসাদে স্কুল খোলেন এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেন। সন্দ্বীপের এক অন্ধ হাফেজ সে মক্তবে ছেলে-মেয়েদেরকে আরবি শিক্ষা দিতেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তিনি হিন্দুস্তানের দেওবন্দ হতে একজন মৌলভি এনেছিলেন। বাংলা ভাষা ও ফারসি শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুগিদিয়ার একজন গুরুমহাশয় ও ঢাকার একজন মুন্সি নিযুক্ত করেছিলেন। সকাল ৬টা হতে ১০টা এবং মধ্যাহ্ন ১২টা হতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রদানের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্যোৎসাহী শমসের গাজী সম্পর্কে "গাজীনামা"য় উল্লেখ রয়েছে:

"তবে গাজি ভান্ডার খানা কৈলা এক বাড়ি।
পাকসালা দেয়ানখানা তোষাখানা ভারি।।
ভান্ডার খানা অধিকার আবুজে ভান্ডারি।
চন্দ্রমুদি তার সঙ্গে খরচ বদ্দারি।।
সতেক তোলোয়া খানা জাগির করিয়া।
গাজি পালে সে সবেরে অন্যবস্ত্র দিয়া।।
সুন্দিবির অুন্দ হাফেজ য়ানিয়া।
কোরাণ পড়া এ পটুকান নিয়া।।
হিন্দুস্তানে হোতে এক মৌলবি আনিল।
আরবি এলাম তোলয়াগণ সিখাইল।।
জুগি দিয়া হোতে এক গুরচ্ছা ...।
লিখখেরে লিখায়ন্ত বাঙ্গলার বানি।।
ঢাকা হতে মনসি আনি পরে পড়াএ।
হেন মতে নিতি সাস্ত্র এলাম শখাএ।।
দিন মৈদ্দে নিউম করিল হনমতে।
দষ দষ দন্ড ধরি দোভালে পড়িতে।।
গাজির হুকুম হোতে নহে বেগ কম।
সময় ভূজন ইতি নিয়ম তামাম।।"

গাজীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ড. রমেন্দ্র বর্মণ[৬] বলেন, "প্রায় সোয়া দু'শ/আড়াই'শ বছর আগে ধর্মবিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার কথা শমসের গাজীর পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব না হলেও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা যে যথেষ্ট উদার ছিল, তা আমাদের স্বীকার করতে হবে নির্দ্বিধায়। বিশেষত, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তো আশ্চর্য রকমের আধুনিক। প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকরি করার জন্য শমসের একে শুধু অবৈতনিক করে ক্ষান্ত হননি, শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি ব্যবস্থা আজও আমাদের বিস্মিত করে।"

প্রজারঞ্জক গাজী

কোনো কোনো ঐতিহাসিক শমসের গাজীকে "বিপ্লবী জমিদার" হিসেবে অভিহিত

[৬] ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ/৩১ ভাদ্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ তারিখে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, সুলেখক ও গবেষক ছিলেন। ১৭ আগস্ট, ২০০৩/৩১ শ্রাবণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ তারিখে আগরতলার ঠাকুর পল্লী সড়কের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

করেছেন। গাজী কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেন। সাধারণ কৃষক ও প্রজাকুলের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি প্রজাদের সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রজাদেরকে নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। "গাজীনামা"র ভাষায়:

"তুমি সবে দেয় জদি খরচ রসদ।
সব্বদিন থাক জদি মোহর মদদ।।
সর্ব্বে অঙ্গিকার আর কৈলাজে তোমার।
ধনে প্রাণে তোমারে পুজিনু বারেবারে।।
জেগতি আমার হএ সে গতি তোমার।
কোন মন্দ না করিয় মনেতে তোমার।।"

ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের কারণে প্রজারা কষ্টে পড়লে গাজী খাজনা মওকুফ করে দিতেন। তিনি অত্যাচারী জোতদার-তালুকদারদেরকে শাস্তি দিতেন। তাদের সম্পদ গরীব প্রজাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন দুর্বলের বন্ধু ও অত্যাচারী সবলের শত্রু।

অভিজাত শমসের গাজী

শমসের গাজী ছিলেন এক অভিজাত ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদে নবাব আলিবর্দি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিস খাঁর বংশধর ও প্রতিনিধি ঢাকার নায়েব নাজিম হোসাইন উদ্দিন খাঁ ছিলেন শমসের গাজীর কন্যা মনু বিবির জামাতা। তাঁর আরেক কন্যা তনু বিবির জামাতা ছিলেন চট্টগ্রামের নিজামপুরের সামন্ত শাহজাদা জাকের মোহাম্মদ-এর পুত্র মোহাম্মদ ঠাকুর। শমসের গাজীর তৃতীয় স্ত্রীও ছিলেন নিজামপুরের দানিয়াল মোহাম্মদের কন্যা।

গাজীর আভিজাত্য, সুশাসন, ন্যায়বিচার, উদারতা, দানশীলতা, সুউচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে "গাজীনামা"য় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

চলিতে গম্ভীর জ্ঞানে রাজা অনুমান।।
বচন অমিয়াভাষ কণ্ঠে সুধাপান।
বসন ভূসন গাত্র দির্ব্ব দিপ্তিমান।।
মিত্র আগে মিত্রাধিক সুত্রয়াগে জম।
দানে দাতা অতিসত্র কর্মেত বিক্রম।।
ইস্তাছেত মহামন্ত্র নহেত বেষ কম।
নরমে নরম অতি গরমে গরম।"

গাজীর জনহিতকর কাজ এবং স্মৃতিচিহ্ন সম্পর্কে আগে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে গাজীর নির্মিত একটি ঐতিহাসিক কীর্তি 'মুতিঘরের' (মুক্তাগারের) বর্ণনা "গাজীনামা"র ভাষায় তুলে ধরা হলো:

"এক তোলা ঘর সোভা। মুনিগণ মোনলোভা।।
জেহেন অমরাপুরি। সভানের মোনহারি।।
দেখীতে নিয়া ছন্দা। জেন সত চন্দ্র বান্দা।।
ঝলকে তারকাগণ। চারি পাশে অভরণ।।
সেই সে ঘরের ঝরা। গুতি তমুতির ছরা।।
হেহেন চামর দোলে। সুবর্ণ সুতির জলে।।
বিন্দু বিন্দু বারি মোহে। গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে।।
... আনন্দ সানন্দ মন। হেন শ্রীবৃন্দাবন।।
রাধিকার কোরে কানু। যেন বৈসে যোগভানু।।"

উপসংহারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বীর-মহাবীরেরা কখনও ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান না; যেতে পারেন না। বরং সময়ের বিবর্তনে তাঁদের অমর গাথা ও মহান কীর্তিগুলো আরও উজ্জ্বল হয়।

শমসের গাজীও চিরকাল এদেশের মানুষের হৃদয়ে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। গাজীনামা, লেখকঃ শেখ মনোহর।

২। গাজীর পুঁথি, লেখকঃ মৌলভী লুৎফুল খবীর।

৩। রাজমালা, এটি ত্রিপুরার মহারাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ। লেখকঃ কৈলাশচন্দ্র সিংহ। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ-১৮৯৬ (শমসের গাজীর মৃত্যুর ১৩৬ বছর পর), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭, প্রকাশক শুভ্রব্রত দেব, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কৃষ্ণনগর প্রধান সড়ক, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

৪। চট্টগ্রামের ইতিহাস, লেখকঃ মাহবুবুল আলম।

৫। চট্টগ্রামের ইতিহাস, লেখকঃ হামিদুল্লাহ খাঁ।

৬। কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, প্রকাশকাল ১৯৮৪। প্রকাশকঃ কুমিল্লা জেলা পরিষদ।

৭। তিন হাজার বছরের নোয়াখালী পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, লেখকঃ কাজী মোজাম্মেল হক, প্রকাশকালঃ ১৯৮২। প্রকাশকঃ মমতাজ মহল বেগম, হিরামন প্রকাশনালয়, ৬৩ বনানী আবাসিক এলাকা, ফেনী।

৮। শমসের গাজী, লেখকঃ মেসবাহুল হক।

৯। হীরকডানা, লেখকঃ স্বকৃত নোমান।

১০। বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, প্রকাশকঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকালঃ মার্চ ২০০৩। খণ্ড-৯।

১১। "গাজীনামা", সংকলন ও সম্পাদনাঃ ড. রমেন্দ্র বর্মণ, প্রথম সংস্করণঃ এপ্রিল ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০১, প্রকাশকঃ শুভ্রব্রত দেব, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

১২। "ফেনীর ইতিহাস", লেখকঃ জমির আহমেদ, প্রথম প্রকাশঃ ২৬ মার্চ, ১৯৯০। প্রকাশকঃ সমতট প্রকাশনী, ৩২, কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

১৩। "ইতিহাসের রূপরেখায় ফেনী", লেখকঃ কাজী মোজাম্মেল হক, প্রকাশকালঃ ১লা আগস্ট, ১৯৭৭।

১৪। "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়", লেখকঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

১৫। "বাঙ্গালা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য (প্রবন্ধ)", লেখকঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৬। The Folk Literature of Bengali Dinesh Chandra Sen.

১৭। History of Bengali Language and Literature, Dinesh Chandra Sen.

১৮. "বৃহত্তর চট্টলা", লেখক: নূরুল হক।

১৯। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ কয়েকটি চ্যানেলে শমসের গাজীর উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন।

২০। শমসের গাজী। লেখক: আহমদ মমতাজ। প্রকাশক, বাংলা একাডেমি। প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৩।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

মোগল বাংলার রাজধানী ঢাকা : পূর্বাপর

কাবেদুল ইসলাম*

Abstract:

Dhaka, formerly spelled as Dacca, the present-day capital of Bangladesh was known to the people of ancient India as well as Bengal particularly to the linguists as there was a dialect called 'Dhakki' which is believed to have been originated in this area. It is interesting to note that this dialect was mentioned in a play named 'Mrcchakatika', which was written sometime in 2nd century B.C. to 6th century AD. Historically, Dacca or Dhaka was a provincial capital during the times of the great Mughals and its journey as so, was taken place sometime in 1608, 1610 or 1612 AD when Islam Khan, one of the ablest generals of Emperor Jahangir invaded the locality and ousted the rebel Afghan chiefs and established his provincial headquarters by the side of the river Buriganga. Subsequently, encircling the headquarters there emerged a new town and people from home and abroad gathered here. In the following pages, however, an attempt has been made to show how Dacca or Dhaka from the mere cradle of a village rose to the highest peak of becoming a metropolis of Bengal 'Suba' ('Suba'—a Persian word, meaning 'province'). Although it is true that from the first decade of the seventeenth century to modern times, Dacca or Dhaka was not a capital continuously. First, the seat of provincial capital was shifted in 1639 by the Mughal Prince Shah Suja, and secondly, when Murshid Quli Jafar Khan became the Subahdar of Bengal, Bihar and Orissa and chose 'Muksusbad' (re-named 'Murshidabad' after his own name) as his headquarters in the second decade of the eighteenth century. But in those days also Dhaka did not loose its importance due to some obvious reasons, especially as the homeland of world-famous 'muslin' and geo-political location, Dhaka continued its name and fame all over India and the world.

---

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বর্তমানে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় পরিচালক পদে কর্মরত। তাঁর এপর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৬।

ভূমিকা

ইংরেজ প্রশাসক-লেখক লুইস সিডনি স্টুয়ার্ড ও'মালী (সংক্ষেপে এল. এস. এস. ও'মালী)-র মতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক– এ-তিন যুগ মিলিয়ে এঅঞ্চলের যে ৯টি শহর ও নগর ইতিহাসের কোনো-না-কোনো পর্বে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বাংলার বা দিল্লি, আগ্রা ইত্যাদির অধীনে বৃহত্তর বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার ('have at one time or other been imperial or provincial capitals') গৌরব অর্জন করেছিল, তার মধ্যে 'ঢাকা'ও ছিল একটি। প্রসঙ্গত অন্য ৮টি হলো[১]– বিহার, নদীয়া, পাটনা, রাজমহল, মুঙ্গের, কটক[২], মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা। স্বীকার্য, ও'মালী আরও কয়েকটি বিখ্যাত রাজধানীর নামোচ্চারণ করেননি, যেমন মগধ[৩], গৌড় বা লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী[৪]) বা জান্নাতাবাদ[৫], সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ, তান্ডা বা তাঁড়া প্রভৃতি।

এগুলোর মধ্যে কলকাতা, গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে রেভারেন্ড জেমস লং (The Rev. James Long)-এর একটি মন্তব্য যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক প্রতীয়মান হওয়ায় এখানে তা তুলে ধরা হলো। তাঁর ভাষায়, 'Calcutta is the sixth capital in succession which Bengal has had within the last six centuries. The shifting of the course of the river, which some apprehend will be the case in Calcutta, contributed to reduce *Gaur* to ruins, though it had flourished for 2,000 years, though its population exceeded a million, and its buildings surpassed in size and grandeur any which Calcutta can now boast of. *Rajmahal*, "the city of one hundred kings," favourably located at the apex of the Gangetic Delta—*Dhaka*, famed from Roman times—*Nuddea*, the Oxford of Bengal for five centuries—*Murshidabad*, the abode of Moslem pride and seat of Moslem revelry,...These were in their days the transient metropolitan cities of the Lower Provinces...'[৬]

যাই হোক, জ্ঞাত ইতিহাসের আলোকে বিশেষ করে মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাবিজয়ী প্রথম মুসলিম শাসক ('the first Muhammadan ruler of Bengal') ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক, সেনরাজবংশ শাসিত তৎকালীন বাংলার রাজধানী নদীয়া, 'নওদিয়া' বা নবদ্বীপ[৭] অধিকারের সময় থেকে (১২০৪-৫) নিয়ে শুরু করে কাদের খান বা মালিক বেদার খিলজি (১৩২৫) পর্যন্ত বৃহত্তর বাংলার রাজধানী ছিল লখনৌতি বা গৌড়।[৮] এরপরে বাংলার সুলতানেরা যখন দিল্লির শাসকদের অধীনতা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন নৃপতিরূপে

রাজত্ব করেছিলেন তখন দীর্ঘকালপর্যন্ত (১৩৫১-১৬০৮) স্বাধীন বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।[৯]

"Sonargaon came into prominence as an administrative center in the early medieval period, when Vikrampur, the ancient capital of *Vanga*, lost its importance. With the establishment of Muslim rule in this area in the closing years of the 13th century Sonargaon came to occupy the position of the capital of the territory of *Bang* and a mint town. It continued to enjoy this prominence, with various vicissitudes, till the occupation of this area by the Mughals in the early part of the 17th century, whence the capital was shifted to Dhaka."[১০]

পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitch) তাঁর ভ্রমণপঞ্জিতে 'সোনারগাঁও'-এর বিশেষত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন, "Sinnergan is a towne sixe leagues from Serrepore, where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India."[১১] মধ্যে পান্ডুয়ায় বা ফিরোজাবাদে এবং সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সময়ে (১৪৪২-৫৯) গৌড়েও রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল।[১২] অন্যদিকে আফগান নরপতি সুলতান সুলায়মান কররানি তাঁর শাসনকালে (১৫৬৫-৭২) তান্ডা বা তাঁড়া-কে করেছিলেন (১৫৬৫) বাংলার রাজধানী।[১৩]

পরবর্তীকালে সুলতানিযুগের অবসানে এবং মোগল রাজত্বের সূচনায় আকবরের সেনাপতি ও বাংলার প্রথম মোগল সুবাদার মুনিম খান, খান-ই-খানান তান্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন গৌড়ে (১৫৭৫)। কিন্তু স্থানটি স্বয়ং সুবাদারসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদের জন্য মারাত্মকভাবে অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় পুনরায় রাজধানী তান্ডায় নীত হয়েছিল। ১৫৯৫ সালে আকবরের আরেক বিখ্যাত সেনানায়ক ও বাংলার সুবাদার রাজা মানসিংহ রাজধানী নির্বাচন করেছিলেন গঙ্গা-তীরের রাজমহল-কে।[১৪] এখানে বলা দরকার যে, প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক ও যোগাযোগ সুবিধার কারণে স্বাভাবিকভাবে আগের রাজধানীগুলোও কোনো-না-কোনো নদ-নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল বা অবস্থিত ছিল; কালক্রমে সেগুলো পরিত্যক্তও হয়েছিল প্রধানত সংশ্লিষ্ট নদীর প্রবাহ বা গতিপথ পরিবর্তনের ফলে। যেমন মানসিংহ কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তরের কারণ সম্বন্ধে খান সাহিব মুহম্মদ আবিদ আলি খান লিখেছেন, "Fluctuations in the river course were again probably the main cause of the transfer."[১৫]

ঢাকা: মোগল বাংলার রাজধানী

মোগলযুগেই (তখন জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল) সুবাদার ইসলাম খান বাংলার নতুন রাজধানী হিসেবে প্রথমবারের ন্যায় ঢাকা-কে নির্বাচিত এবং এখানেই তাঁর

ক্রমপ্রসারমান অধিক্ষেত্রের সদর দপ্তর (Headquarters) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (এবিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)। শাহজাহান-তনয় সুবাদার মুহম্মদ শাহসুজার যুগে ১৬৩৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগের স্থান– রাজমহলে। কিন্তু দুই দশক পরে আওরঙ্গজেবের যুগে তাঁর নিযুক্ত বাংলার প্রথম সুবাদার মিরজুমলার সময়ে ১৬৬০ সালে এসে রাজমহলের পরিবর্তে দ্বিতীয়বারের ন্যায় ঢাকা হয়েছিল প্রাদেশিক বা সুবে বাংলার রাজধানী।

এর পর ১৭০৪ সালে (তখনও আওরঙ্গজেব জীবিত) কারতলব খান ওরফে নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান নাসিরি (সম্রাটের লিখিত ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ততদিনে তিনি এঅঞ্চলের প্রায় একচ্ছত্র শাসক হয়ে উঠেছিলেন) তাঁর নিয়ন্ত্রিত 'দিওয়ানি' বা খালসা বিভাগ ও আনুষঙ্গিক দপ্তরাদি ঢাকা থেকে গঙ্গা তথা হুগলি নদীতীরবর্তী 'মকসুসাবাদে' (একে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত করেন 'মুর্শিদাবাদ' পদবাচ্যে) স্থানান্তরিত করলে এবং খোদ সুবাদার আজিম-উশ-শান বিহারের রাজধানী পাটনায় স্থায়ীভাবে বদলি হলে রাজধানী ঢাকার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেকখানিই অবসিত হয়েছিল। এই মর্যাদা পরবর্তী প্রায় দু-শ' বছরের মধ্যে ঢাকা আর ফিরে পায়নি।

যাই হোক, উপরের আলোচনায় দুটো ব্যাপার তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষণীয়।

এক. আকবর> জাহাঙ্গির> শাহজাহান> আওরঙ্গজেব– পরপর এই চার জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটের প্রায় দেড়শ' বছরের শাসনকালে সুবে বাংলার রাজধানী ঘন ঘন পরিবর্তিত (প্রত্যেকের সময়েই, কারও সময়ে একাধিকবারও) হলেও তা আবর্তিত হয়েছিল ৪টি স্থানকে কেন্দ্র করে, যথা– গৌড়, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ।

দুই. এর মধ্যে প্রথম দুটো থেকে রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরের অন্যতম কারণ নদীখাত পরিবর্তনজনিত হলেও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে তা সরিয়ে নেয়া হয়েছিল সম্পূর্ণত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে বা আরও নিশ্চিত করে বললে, একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত খেয়ালে, দৃশ্যত তাঁর জীবনের তথা দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের অজুহাতে।

বাংলার দিওয়ান (১৭০০-) কারতলব খান ওরফে মুর্শিদকুলি খান, তৎকালীন বাংলার সুবাদার ও সম্রাট-পৌত্র আজিম-উশ-শান নিযুক্ত গুপ্তঘাতকদের আক্রমণ (ঢাকার রাজপথে একবার তিনি অকস্মাৎ আক্রমণের শিকারও হন, তবে পূর্বেই তা আঁচ করতে পারায় বেঁচে যান) তথা ভবিষ্যতে সুবাদারের অনুরূপ যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে সম্রাটের অনুমোদনক্রমে দিওয়ানি দপ্তরাদি, অন্যকথায় প্রশাসনযন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (যা প্রায় অর্ধেকাংশ) ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেন, এবং পরে তিনি খোদ সুবাদার হলে নিজামতও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১৬] অথচ এসময় মোগল বাংলার সমৃদ্ধ রাজধানী ঢাকার মূল শহরটি ঘেঁষে বহে চলা বুড়িগঙ্গা তখনও ছিল পরিপূর্ণ যৌবনা এক উদ্দামগতি স্রোতস্বিনী; এর নদীখাত পরিবর্তনের তো প্রশ্নই ওঠে না।

পরবর্তীকালে প্রথম ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করেছিলেন কলকাতায়, ১৭৭২-৭৩ সালে। তার আগে অবশ্য সাময়িককালের জন্য নবাব মির কাশিমের সময়ে (১৭৬১-৬৩) রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল 'মুঙ্গের'-এ।[১৭] প্রসঙ্গত রাজধানী হিসেবে কলকাতার মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল ১৯১২ সালপর্যন্ত। অতঃপর অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশের তথা বাংলার রাজধানী ছিল প্রথমত কলকাতা এবং বাংলা বিভাজিত হলে এর একটি অংশের রাজধানী হয়েছিল ঢাকা (১৯০৫-১১)।

যাই হোক, এপর্যন্ত আলোচনায় ও'মালী-কথিত নয়টি এবং বর্ণিত অপরাপর রাজধানীগুলোর মধ্যে ঢাকা ও কলকাতার বিশেষত্ব এই যে, অন্যগুলোর (বিহার ও পাটনা-কে এখানে ধরা হচ্ছে না) একসময়কার আভিজাত্য, সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি মহাকালের বিবর্তনে হ্রাসপ্রাপ্ত বা একেবারে বিলুপ্ত হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় ঢাকা ও কলকাতার ক্ষেত্রে তা মোটেও ঘটেনি। বরং এ দুটোর বিশ্বব্যাপী পরিচিতি, এখানকার ভূখণ্ডে বা ভৌগোলিক পরিসীমায় মানব-বসতির বিস্তার এবং সর্বোপরি ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্রমাগত ঘটেছে, এবং ঘটেই চলেছে। আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে একপর্যায়ে কলকাতা থেকে অবিভক্ত বাংলার (বিহার ও ওড়িশা[১৮]-সহ) তথা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ভারতবর্ষেরই আরেকটি অতিবিখ্যাত স্থান 'দিল্লি'-তে স্থানান্তরিত[১৯] (১৯১২) এবং তজ্জনিত দেশের রাজধানী-নগরী হিসেবে কলকাতার মর্যাদা ও আভিজাত্য স্থায়ীভাবে অবলুপ্ত বা তিরোহিত হলেও[২০] এবং দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গুরুত্ব হারালেও, ঢাকা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় আগাগোড়াই প্রথমত প্রাদেশিক এবং পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী থেকে গিয়েছে এবং আছে। এবং শেষোক্ত সুবাদে এর মর্যাদা, গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফলত কলকাতাসহ এপর্যন্ত আলোচিত অন্য রাজধানীগুলোর সঙ্গে ঢাকার ঐতিহাসিক ললাটলিখনের এই বিশেষত্ব ও পার্থক্য মোটেও অস্বীকার করা যায় না।

এখানে ইংরেজযুগের প্রাথমিকপর্বে বিদেশি নবীন শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে অনেকটা পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকা উত্তর-মধ্য আঠারো শতকের বাংলার রাজধানী কলকাতা এবং মোগলযুগের সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকার একটি তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ব্রাডলী বার্ট তাঁর *Sylhet' Thackeray* শীর্ষকগ্রন্থে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হওয়ায় খানিকটা দীর্ঘ হলেও তাঁর ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হলো: "No Eastern capital was more fortunate in its approach than Dacca, in the middle of the eighteenth century...Picturesque, however, as Dacca appeared from the river approach, a closer acquaintance with it revealed an even greater charm...To Calcutta which, Eastern as it was in many respects, owed its origin entirely

(অর্ধেক হরি এবং অর্ধেক শংকরা [*শংকর?*]) পাওয়া যায়। 'প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু কালো ফ্লোরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তিটি দেখতে খুবই সুন্দর, এটা সেন রাজত্বকালে (১১-১২ শতাব্দী) নির্মিত বলে মনে করা হয়। তেজগাঁও রেল স্টেশনের দু'ফার্লং উত্তরে রেললাইনের ওপর নির্মিত পাকা ওভার ব্রিজের কাছে ওই মূর্তিটা পাওয়া যায়।' খণ্ড খণ্ড এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম-পূর্ব যুগেও এ এলাকায় ঢাকার অস্তিত্ব ছিল।"[২৪]

দানী-পরবর্তীকালে যাঁরাই ঢাকার প্রাচীনেতিহাস সম্পর্কে দু-চার ছত্র লিখেছেন বা লিখবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ৭ম শতকের কথিত গুপ্তযুগীয় স্বর্ণমুদ্রা, ১১-১২শ শতকের হরিশঙ্করের মূর্তি এবং ঢাকার নামের সঙ্গে সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৪র্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 'ডবাক' ('দেবকা') শব্দটির উল্লেখ বা অবতারণা করেছেন।[২৫] কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলোর প্রামাণিকতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশয়পূর্ণ।

ঢাকার প্রাচীনত্বের প্রমাণ অবশ্য অন্য সূত্র থেকেও কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। বহুভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান'* (ভূমিকা) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কতিপয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ ঢক্কী অপভ্রংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। R. Pischel ঢক্কীকে পূর্ব বাংলার ঢক্ক নগর হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। (Grammatik der Prakrit Sprachen, প্যারা)। ইহাতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীন দেশী ভাষার নাম পাইতেছি ; কিন্তু কোনও স্থানে রাঢ়ী প্রাকৃতের বা রাঢ় অপভ্রংশের নাম আমরা পাই না। আধুনিক বাংলা নামও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন বঙ্গাল দেশের নাম হইতে ব্যুৎপন্ন। 'বঙ্গাল' শব্দটি রাজেন্দ্র চোলের একাদশ শতকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[২৬]

এখন দেখা যাক রিচার্ড পিশেল (Richard Pischel)-এর গ্রন্থে কী পাই! সরাসরি জার্মান ভাষা থেকে সুভদ্র ঝা (Subhadra Jha) কর্তৃক অনূদিত তাঁর *A Grammar of the Prakrit Languages* শীর্ষকগ্রন্থে এসম্বন্ধে পাচ্ছি: "In Mrcchakatika p. 29-39, Mathura, the keeper of the house of gambling, and his fellow player speak the dialect, called Dhakki, named after Dhakka that is in Bangla Desh. Mk. fol. 81, Rv. in LASSEN, Inst. p. 5, and Prthvidhara on Mrcch. p. –V=p. 493, ed. GODABOLE, record Dhakki along with Sakari, Candali and Sabari among the dialects of Apabhramsa. Corresponding to its geographical situation it seems that Dhakki was a transition-dialect between Magadhi and Apabhramsa."[২৭]

এখানে উল্লিখিত 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থটি একটি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, এর রচয়িতা শূদ্রক। কেউ কেউ এঁকে তখনকার একজন রাজা বলেছেন। যাই হোক, গ্রন্থটির রচনাকাল তথা শূদ্রকের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা বর্তমান। যেমন Albrecht Weber এটির রচনাকাল বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী[২৮]; অন্যদিকে A. L. Basham সম্পাদিত *A Cultural History of India* গ্রন্থে পাই খ্রিস্টীয় ৩য় শতক[২৯] এবং Arthur A. Macdonell-এর ধারণায় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক।[৩০] মোটামুটি হিসেবে ধরা যায়, 'মৃচ্ছকটিক' বা এর রচয়িতা শূদ্রকের কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ২য় থেকে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক– এর মধ্যে যে কোনো এক সময়।[৩১]

ফলত বর্ণিত 'ঢক্কী অপভ্রংশ'-এর বিষয়টি যদি নিশ্চিত ধরা হয়, তাহলে স্বনামে ঢাকা সেই প্রাচীনযুগ তথা খ্রিস্টাব্দের আগে বা পরের কাল থেকে অন্তত ভাষাবিজ্ঞ ও বৈয়াকরণগণের নিকট পরিচিত ছিল, তা অনস্বীকার্য। তারপরও বলতে হবে এসবই অস্পষ্ট সূত্র। বরং এখন পর্যন্ত যেটা সত্য তা হলো, ''প্রাক মোগল আমলের ঢাকার ইতিহাস আজো অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে।"[৩২]

সুলতানি আমলের ঢাকার স্বনামে অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ অবশ্য ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। এব্যাপারে বলার আগে আবদুল করিম লিখিত এ-বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ঢাহাকা নামক একটি প্রাচীনতম স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় বীরভূম জেলায় আবিস্কৃত ১৪৬০ সালের সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবাক শাহের একখানি শিলালিপিতে। কিন্তু এ শিলালিপিতে বর্ণিত স্থান ও আধুনিক ঢাকা একই স্থান কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ঢাকা সম্পর্কিত পরবর্তী এবং সন্দেহাতীত সূত্র হচ্ছে আনুমানিক ১৫৫০ সালে অঙ্কিত জোয়াও ডি ব্যারোস-এর মানচিত্র।"[৩৩]

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলেই পাওয়া গিয়েছে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ-এর সময়ের (১৪৩৫-৫৯) মসজিদভিত্তিক দুটি প্রস্তরলিপি।[৩৪] এর একটি নারিন্দা এলাকায় অবস্থিত 'বিনত্ বিবির মসজিদের খোদাই পাথর' (১৪৫৭) এবং অন্যটি 'নসওয়াল্লাগলির মসজিদের খোদাই পাথর'।[৩৫]

যাই হোক, এবিষয়ে বিশদ না বলে শুধু এটুকু বলা যায়, বাংলার মধ্যযুগে বা সুলতানি আমলে ঢাকা স্বনামে শুধু পরিচিত-ই ছিল না, এখানে মুসলিম বসতির ব্যাপক বিস্তারও শুরু হয়েছিল। আর মোগলযুগে ঢাকা তো যথেষ্ট প্রসিদ্ধই ছিল, এর সবচেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মোগল দরবারি ঐতিহাসিক ও আকবরের নবরত্নের অন্যতম আবুল ফজল আল্লামি-র *আইন-ই-আকবরি*-তে স্বনামে 'ঢাকা বাজু'[৩৬] নামের একটি মহাল বা পরগনা হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তি, যার রাজস্ব আয় ছিল ১৯,০১,২০২ 'দাম' (মোগলযুগে প্রচলিত এক ধরনের তাম্র মুদ্রা)। স্মর্তব্য যে,

'সরকার-ই বাজুহা'য় মোট ৩২টি মহাল বা পরগনা ছিল, এর মধ্যে রাজস্ব আয়ের দিক দিয়ে ঢাকার উপরে ছিল মাত্র ৮টি, অবশিষ্ট ২৪টি ছিল ঢাকার নীচে। ফলে সহজেই ধারণা করা যায়, মোগল রাজস্ব-ব্যবস্থায় ও ব্যবস্থাপনায় ঢাকার ভালোই গুরুত্ব ছিল।

বস্তুত স্বনামে ঢাকার প্রামাণ্য প্রাচীনেতিহাস আজ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত থাকলেও স্বনামে হোক কি অন্য নামে, ঢাকাসন্নিহিত অঞ্চল অতিপ্রাচীনকালেও যে একেবারে জনবসতিশূন্য, অখ্যাত স্থান ছিল না, তা আরেকভাবেও প্রমাণ করা যায়। যেমন সাম্প্রতিককালে নরসিংদী জেলার বেলাব থানা থেকে মাত্র ৫-মাইল দূরের গ্রাম উয়ারী-বটেশ্বরে মাটিখননের ফলে আবিস্কৃত বা প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনাদির কথা যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, তবে অতিঅবশ্যই স্বীকার করতে হবে, একদা বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্গত এস্থানটি সুপ্রাচীনকাল (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ) থেকেই ছিল বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কায়-কারবারের অন্যতম পীঠস্থান।[৩৭]

কাজেই উয়ারী-বটেশ্বরের এত কাছাকাছি, তাও চিরপ্রবাহমান গঙ্গার দূরগামী এক নিত্যচঞ্চলা স্রোতস্বতীর তীরবর্তী একটি ভূখণ্ড– 'ঢাকা', যার একটা বড় অংশের ভূমি সদ্যোত্থিত পললজাত নয়, বরং শক্ত ও বাসোপযোগী, সেই অঞ্চল সেযুগে একেবারে মানব-বসতবিহীন ছিল, এমন ভাবাটা যুক্তির নিরিখে অচল।

ফলে আজকের 'ঢাকা' বা 'ঢাকাশহর' বলতে যে-স্থানটি বোঝায় সেটি প্রাচীন ও মধ্য যুগের একটা উল্লেখযোগ্য সময়পরিসর অবধি অতিখ্যাত ভূখণ্ড না হলেও মধ্যযুগের অন্ত্য-মধ্যনাগাদ তা স্বনামেই ইতিহাসে স্থান ও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেটা মোগলযুগে আকবরের রাজত্বকালে না হলেও তৎপুত্র জাহাঙ্গিরের শাসনকালে রাজধানী হিসেবে এর অগ্রযাত্রা শুরুর পর থেকে অবশ্যই।

এপ্রসঙ্গে স্যার চার্লস ড'য়লী-র মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন, ''সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের ঢাকা নগরীর কোনো রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না। আকবরের প্রসিদ্ধ 'তুকসীম জুম্মা'-তেও এই নগরীর কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতিবৃন্দ যখন বাংলা আক্রমণ ও অধিকার করেন তখন সোনারগাঁওই ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বন্দরনগরী। পরে জাহাঙ্গীর তাঁর সুবে বাংলার গভর্ণরের বাসস্থান হিসাবে ঢাকাকে নির্বাচিত করেন। তখন থেকেই ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ ও উন্নতির সু(সূ)ত্রপাত, আর সোনারগাঁও-এর বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবনতি। কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা ও আয়তনে ঢাকার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ঢাকা পরিণত হয় বাংলার প্রধান শহরে।"[৩৮] তিনি আরও যোগ করেছেন, ''সমগ্র দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঢাকার চেয়ে সুন্দর অবস্থান খুব কম শহরেরই আছে। একটি বড়ো নদীর তীরে এই শহর। নদীটি অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের সঙ্গেও যুক্ত।"[৩৯]

ড'য়লীর এ-বক্তব্য আক্ষরিকার্থেই সত্য, যা আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রমাণিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এব্যাপারে বিশদ আলোচনার জায়গা এটা নয়।

স্মর্তব্য যে, মোগল-নবাবি যুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ঢাকা নিয়াবত' (Neabut of Dacca)-কে জেমস গ্রান্ট তাঁর সুবিপুল তথ্য-পরিসংখ্যানপূর্ণ অনন্যসাধারণগ্রন্থ *Historical and Comparative ANALYSIS of the FINANCES of BENGAL*-এ 'বৃহৎ বা মহা প্রদেশ' ('great province') রূপে আখ্যায়িত করেছেন; এটি ছিল, তাঁর ভাষায়– 'the former seat of Soubahdarry government, under the denomination of Jehangeernagur, and known on the khalsa records by the pergunnahty name of Jelah(l?) poor,..'[৪০]

ঢাকা: মোগলযুগ

বস্তুতপক্ষে মোগল সুবাদার বা নবাব-নাজিমদের মধ্যে কীর্তিধন্য কয়েক জনের সময়েই ঢাকার ছিল প্রকৃত ও সবচেয়ে রমরমার দিন। অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল ঢাকা মোগলদের অন্যতম প্রদেশ বাংলামুলুক বা সুবে বাংলার রাজধানী হওয়ার পর থেকে। এপর্যায়ে আমরা ঢাকার প্রথম রাজধানী হওয়ার এবং সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকার উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা কিছুটা বলব।

১৫৭৫-৬ সালে সেনাপতি মুনিম খান, খান-ই-খানানের সঙ্গে প্রথমে তুকারয় বা তুর্কা-কসবা বা মোগলমারির এবং পরে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানির পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়ে এঅঞ্চলে মোগলাধিকারের গোড়াপত্তন। তবে বাংলায় মোগলশাসন পুরোপুরি জেঁকে বসতে আরও বেশ কিছু কাল লেগেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই বলেছেন, ''১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মুঘলের রাজ্য-শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। (*এ সময়*) বাংলাদেশে একজন মুঘল সুবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়া চলিত; অন্যত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈন্য লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত–মুঘল সৈন্যেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া ''জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি অনুসরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।"[৪১]

জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে[৪২] এঅঞ্চলে মোগলদের সর্বব্যাপী আধিপত্যবিস্তার সম্ভব হয়েছিল সতেরো শতকের গোড়ার দিকে বুড়িগঙ্গা নদীতীরের ঢাকায় সুবাদার ইসলাম

খান কর্তৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠার বা স্থাপনের ফলে; ফলত খানের একক কীর্তি এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয়। যদিও তাঁর আগে-পরে বেশ ক'জন প্রবল প্রতাপ মোগল সুবাদার বাংলায় সুবাদারি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দু-চারজনের মুখ্য কীর্তিসম্বন্ধে নীচে প্রাসঙ্গিক ধারণা দেওয়া হলো।

সুবাদার রাজা মানসিং

বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর আম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ ১৫৯৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলার তৎকালীন রাজধানী তান্ডায় এসে পৌঁছেছিলেন। এখানে এসেই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল, পরাজিত ও পলাতক কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লুকিয়ে থেকে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাওয়া আফগান নেতাদের এবং বিদ্রোহী ও প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠা জমিদার-ভূস্বামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানাদিকে সৈন্যপ্রেরণ বা অভিযান। আবুল ফজল-এর *আকবরনামার* ভাষ্য থেকে জানা যায়, "When Raja Man Singh came to Tanda, the capital of Bengal, he sent off troops in all directions."[৪৩]

নিযুক্তির মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে ছিল পূর্ব- ও দক্ষিণ বাংলায় আফগান শক্তি ও অতর্কিত আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়া, যা তান্ডা থেকে সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণের মধ্যে ছিল, পূর্বে প্রাদুর্ভূত ভয়াবহ মহামারি, যা এসময় তান্ডাকে প্রায় জনশূন্য করে ফেলেছিল[৪৪] এবং সর্বোপরি তান্ডাসন্নিহিত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এর জলবায়ু ও সামগ্রিক পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর গণ্য হওয়ায় মানসিংহ ১৫৯৫ সালের নভেম্বর নাগাদ তান্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনে তান্ডা সরকারেরই একটি অন্যতম মহাল 'আক-মহাল' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নতুন রাজধানীর নাম দেন ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামে 'আকবরনগর'। আবুল ফজল লিখেছেন: "On this day Akbarnagar was founded. When Raja Man Singh was in Bengal he considered about a seat of government which could to some extent be safe from an attack by boats. After much inquiry a place was found near Akmahal (Rajmahal). Apparently Sher K. had approved of it. The foundation was laid in a fortunate hour, and in a short time there was a choice city, to which the glorious name was given."[৪৫]

এ-রাজধানীটিও ছিল গঙ্গাতীরবর্তী এবং একদিকে উঁচু পাহাড়-টিলাবেষ্টিত।[৪৬]

ঢাকায় এসে রাজা মানসিংহ প্রথম যা করেন তা হলো, বিদ্রোহী হিন্দু জমিদার শ্রীপুরের কেদার রায়-কে 'সঠিক পথে আনতে' তথা সম্রাটের অনুগত করতে 'by

means of hopes and fears'-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাকে আটক।[৪৭] তাঁর সময়ে ঢাকাসম্পর্কিত প্রধান ঘটনাটি হলো তৎপুত্র দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে মোগল নৌবাহিনীর সঙ্গে 'কত্রাভু' বা 'কর্তাপুর' (ঢাকা) নামক স্থানে বিখ্যাত বারো-ভুঁইয়া নেতা ও সোনারগাঁও প্রভৃতি ভূভাগের অধিপতি ঈসা খাঁ[৪৮] ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী অমিততেজা মুসা খাঁর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, যাতে সম্মুখ সমরে মোগলবাহিনী চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, এবং দুর্জন সিংহ-সহ কয়েকজন মোগল সেনাপতি ও প্রচুর সৈন্য নিহত এবং আফগানদের হাতে বন্দি হয়েছিল।[৪৯]

যাই হোক, এখানে আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে, রাজা মান সিংহের যুগে রাজধানী আকবরনগরে বা রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশাল সুবে বাংলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থান এবং 'ভাটি' (সিলেট প্রভৃতি অঞ্চল)-র বিদ্রোহ দমনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও কার্যকর ঘাঁটি হিসেবে ঢাকা ছিল সুবাদারের তথা সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর– 'the temporary headquarters of the Bengal governor'।[৫০] ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বাংলামুলুকের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন শ্রীপুর (কেদার রায়ের বিরুদ্ধে), যশোহর (রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে), ভাওয়াল (ওসমান খানের বিরুদ্ধে), শেরপুর বা বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি যুদ্ধপরিচালনা এবং কোথাও কোথাও নিজেও যুদ্ধযাত্রায় শরিক হয়েছিলেন। কৌশলগত কারণে এসময় তাঁকে ঢাকাতেই মূলত অবস্থান করতে হতো। আখেরে এর অনিবার্য ফল যা হয়েছিল, তা– "Thus, the commotion in Bengal was completely quelled and the Raja's mind was set at rest. He committed the outposts to the charge of able men and himself went to Dacca."[৫১] সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক কারণে ঢাকার গুরুত্ব মোগল শাসনের প্রায় প্রথম যুগ থেকেই ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক।

প্রসঙ্গত রাজা মানসিংহের বাংলাত্যাগের সমসাময়িক তথা সতেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিকের বাংলাসম্পর্কে *A Short History of Calcutta: Town and Suburbs* গ্রন্থের লেখক এ. কে. রায় লিখেছেন, "BEFORE Mansingh came to Bengal, it had been, in spite of Akbar's great name, a hot bed of intrigue and quarrel. When he was recalled in 1606 A.D. for service in the Deccan, he left Bengal in a state of complete tranquility. All the rebels had been defeated and their leaders killed, imprisoned, or pardoned; the revenues of the mahals had been fixed; the rank and status of the more important public servants, both Hindu and Muhammadan, had been definitely and authoritatively laid down."[৫২]

এই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুবই অল্পকালের জন্য। যদিও বড় ধরনের সম্মুখ যুদ্ধ করবার মতো শক্তি-সামর্থ্য তখন পলাতক আফগান নেতাদের বিশেষত হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের আর অবশিষ্ট ছিল না, তা সত্ত্বেও মোগল সৈন্যদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা তারা অব্যাহত রেখেছিল। সেইসঙ্গে ছিল আরাকানি-মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ, লুঠতরাজ ও খুন-জখম। বস্তুত এরকম এক টালমাটাল পরিস্থিতিতেই মধ্যকালীন বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছিল সুবাদার ইসলাম খান চিশতির।

সুবাদার ইসলাম খান[৫৩]

আগেই জানিয়ে রাখি, সুবাদার ইসলাম খানও মূলত রাজনৈতিক কারণে রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তবে এবারে নতুন সুবাদারের পক্ষে বিদ্রোহী ও পলাতক আফগান নেতাদের দমনের সমান্তরালে আরাকানি-মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের নৃশংস আক্রমণ মোকাবিলার জন্যও রাজধানী স্থানান্তর জরুরি হয়ে পড়েছিল। এপ্রসঙ্গে *Journal of Royal Asiatic Society, Bengal, July, 1909*-এ উল্লেখ করা হয়েছে: "Islam Khan removed the capital from Rajmahal to Dacca in 1612. This was done in order to check and subdue the Afghan remnants under Usman as well as the Arakanese and Portuguese buccaneers."[৫৪]

এখানে সুবাদার ইসলাম খান চিশতির শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে কবে বা কখন ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত বা স্থাপিত হয়েছিল, সেই অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বিতর্কপ্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। তার আগে বলা ভালো যে, একেবারে সন-তারিখ চর্চিত বা নিশ্চিত করে ঠিক কখন ঢাকা-কে রাজধানী করা হয়েছিল, সেসম্পর্কে সমসাময়িক দরবারি লেখক-ঐতিহাসিকদের রচনায়, সম্রাটদের কারো কারোর আত্মজীবনী বা অনুরূপ কোনো বিবরণীতে দৃষ্টিগোচর হয় না, অন্যকথায় এজাতীয় সুস্পষ্ট তথ্য কোনো সূত্রেই লভ্য নয়। অন্যদিকে মোগল আমির-ওমরাহদের কীর্তিকলাপসম্বলিত অনন্যসাধারণ যে-গ্রন্থটি রয়েছে, যেটির অভিধা *মাসির-উল-উমারা*, তাতে সুবাদার ইসলাম খানের নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি থাকলেও, তৎকর্তৃক রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত।

অবশ্য ইসলাম খান ঢাকা-কে কেন্দ্র করেই যে এ-অঞ্চলে আফগান ও অন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা খোদ জাহাঙ্গিরের বিবরণী *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি*তেই পাওয়া যায়। যেমন এতে রয়েছে: "Islam Khan took up his quarters at Dacca, to bring the *zamindars* of that vicinity to submission, and he formed the design of sending an

army against Usman and his country, to induce him to make profession of allegiance, or else to exterminate him and his turbulent followers."[৫৫]

বস্তুতপক্ষে ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের কাল হিসেবে ৩টি সন বা বর্ষ পাওয়া যায়, যথা ১৬০৮, ১৬১০ ও ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ। এখন দেখা যাক, আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে কে, কী বলেছেন এবং এঁদের কার বক্তব্যটিকে সঠিক বা অন্তত সম্ভাব্য সত্যের কাছাকাছি বলে ধরে নেয়া চলে।

ইংরেজ লেখক-ঐতিহাসিক এবং আধুনিক ইতিহাসবিদদের একদল মনে করেন, সুবাদার ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে এনেছিলেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। এমতের প্রবক্তাদের অন্যতম স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার।[৫৬] এ দলে আরও আছেন ওয়াল্টার হ্যামিলটন, আর্চিবল্ড কনস্টেবল, বি. সি. অ্যালেন[৫৭], এল. এস. এস. ও'মালী[৫৮], জে. জে. এ. ক্যামপস[৫৯], এবং আধুনিকদের মধ্যে এম. আই. বোরা[৬০], আহমদ হাসান দানী[৬১], যতীন্দ্রমোহন রায়[৬২] প্রমুখ। এঁদের প্রতিনিধিত্বশীল দু-একজনের মত উদ্ধার করা হলো।

ওয়াল্টার হ্যামিলটন লিখেছেন, "That Dacca is a city comparatively modern is proved by its not being mentioned by Abul Fazel, at least under that name, in the Ayeen Acberry. In A. D. 1608 the seat of government was removed from Rajmahal to this place by the then governor of Bengal, Islam Khan, and in compliment to the reigning emperor its name changed to Jehangire Nuggur."[৬৩]

আর্চিবল্ড কনস্টেবল বলেন, "Islam Khan, Shaikh, in 1608, had made Dacca the capital of the Province of Bengal. This city is on the Burhiganga River, formerly no doubt, as its name (*Old Ganges*) implies, the main stream of the Ganges. This river falls into the Meghna, a branch of the Brahmaputra,..."[৬৪]

রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৬১০ সাল বলে গণ্য করবার পক্ষপাতী আধুনিক ঐতিহাসিকদের অন্যতম আবদুল করিম। তাঁর ভাষায়, "Established as the capital of Bengal in 1610, Dacca continued to retain this status during the next one century."[৬৫]

এবিষয়ে আরও যেসব মত[৬৬] পাওয়া যায়, সেসম্পর্কে জনাব করিমের বক্তব্য উদ্ধার করা হলে অনেকখানি জানা যাবে বলে মনে করি। তাঁর ভাষায় (দীর্ঘ বক্তব্যের শুধু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত):

"Modern scholars do not agree on the date and cause of the transfer of the Mughal capital of Bengal to Dacca...As for the date of the transfer, S. N. (*Sudhindra Nath*) Bhattacharya takes up the discussion of the date of Islam Khan's appointment as *subahdar* of Bengal and the transfer of the capital at a time..., he says that Islam Khan had been appointed *subahdar* about the beginning of the rains of (April-May) 1608 and that the *subahdar* reached Dacca about the middle of 1610...As for the status of Dacca as a capital town, the learned scholar suggests that soon after the entry of Islam Khan into Dacca, the place was formally named Jahangirnagar but after the defeat of Usman Khan it was formally acknowledged as the capital of the Bengal *Subah* in place of Rajmahal...N. K. Bhattasali and M. I. Borah next dwelt upon the subject...On the question of the date both Bhattasali and Borah hold an altogether different view...they state that Islam Khan was appointed *subahdar* of Bengal in 1607 and he reached Dacca in July 1608. Later writers generally accept this view."[৬৭]

ঢাকার রাজধানী হিসেবে যাত্রার প্রকৃত কালসম্পর্কিত এ-মতদ্বৈধতার আপাত নিষ্পত্তিমূলক ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক তথ্যপঞ্জি আবদুল করিম কর্তৃক দীর্ঘপরিসরে বিবৃত হয়েছে তাঁর বর্ণিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে।

এখানে যদুনাথ সরকারের *'বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন'* শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তাঁর গ্রন্থিত '৪। ইস্‌লাম খাঁর বঙ্গশাসন' অনু-শিরোনামভুক্ত সন-তারিখযুক্ত ফিরিস্তিটি যদি তুলে ধরা হয়, তা হলে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১০ সালেই ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা হবে।

''২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইস্‌লাম খাঁকে বিহার হইতে বাঙ্গলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন।/ ৫ জুন, বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হসন্ আগ্রা হইতে রাজমহল পৌঁছিলেন। এখানে ইস্‌লাম খাঁ অগ্রেই আসিয়াছিলেন।/ ১৩ জুন, ইহতমাম খাঁ তোপ ও নওয়ারা লইয়া আগ্রা হইতে বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।/ ৭ ডিসেম্বর, ইস্‌লাম খাঁ সসৈন্যে নৌকাযোগে গঙ্গা বহিয়া রাজমহল হইতে নিম্নবঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।/ ২ জানুয়ারী ১৬০৯, ইস্‌লাম খাঁ মুর্শীদাবাদের গোয়াশ্ পরগণার ধারে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ সরকারে আলাইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া প্রায় দুই মাস বাস করিলেন।/ ২ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ আলাইপুর হইতে নাজিরপুরের দিকে (উত্তরে) কুচ আরম্ভ করিলেন।/ ৫ বা ৬ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ ফতেপুরে থামিলেন।/ ৩০ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া রাণা টাণ্ডাপুরে পৌঁছিলেন।/ ২৬

এপ্রিল, বজ্রপুরে প্রতাপাদিত্য ইস্‌লাম খাঁ(র) সহিত দেখা করিলেন।/ ৩০ এপ্রিল, ইস্‌লাম খাঁ আত্রেয়ী নদীর ধারে শাহপুরে পৌঁছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতী ধরিলেন।/ ২ জুন, ইস্‌লাম খাঁ শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাঁধিয়া ঘোড়াঘাট পৌঁছিলেন।/ ১৫ অক্টোবর, ইস্‌লাম খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া বহিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ।/ ১৮ ডিসেম্বর, ইস্‌লাম খাঁ পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। পরে মুসাখাঁর সহিত যুদ্ধ।/ জুন ১৬১০, ইস্‌লাম খাঁ বারভুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।/ মার্চ্চ ১৬১১, মুসাখাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ।/ নবেম্বর, উস্‌মান বোকাইনগর হইতে শ্রীহট্টে তাড়িত হইলেন।/ জানুয়ারী ১৬১২, প্রতাপাদিত্যের পতন।/ ২ মার্চ্চ ১৬১২, উস্‌মানের যুদ্ধে মৃত্যু।/ ১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যু।"[৬৮] বলাবাহুল্য এখানে বর্ণিত সন-তারিখ মেনে নিলে, ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপন ১৬১০ সালের আগে কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

এপর্যায়ে আমরা আবদুল করিম ও অন্যান্য লেখক-ঐতিহাসিকদের রচনায় এযাবৎ অনুল্লিখিত দুটো উৎস উদ্ধৃত করব। যেমন *মাসির-উল-উমারায়* এই মর্মে স্পষ্ট বলা হয়েছে দেখতে পাই: "In the 3rd year, he (*Islam Khan Chishti Faruqi*) was made, after the death of Jahangir Quli Khan Lala Beg, the governor of Bengal. As that country had from the time of Sher Shah been in the possession of Afghan officers, large armies were sent there in Akbar's time under the leadership of high officials, and for a long time there was much fighting, etc...When Islam Khan's turn came, he arranged an army under the leadership of Shaikh Kabir Suhjaat Khan—who was nearly related to him—and it set out along with auxiliary officers, from Akbarnagar (Rajmahal) against Uthman Khan and after achievements which put the masterpieces of Rustam and Isfandiyar into oblivion—Uthman Khan was sent to annihilation and his brother (Wali Khan) made his submission. As a reward for this good service, he, in the 7th year was promoted to the rank of 6,000. In the 8th year, 1022 A.H. (1613 A.D.) his life came to an end."[৬৯]

পরবর্তী আলোচনার স্বার্থে উদ্ধৃত অংশ থেকে কয়েকটি জরুরি তথ্য গ্রহণ করা যায়।

এক. ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন জাহাঙ্গিরের সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয়বর্ষে, খ্রিস্টাব্দের হিসেবে যা হয় ১৬০৮। এসময় তিনি বিহারের সুবাদার ছিলেন। মনে রাখতে হবে বিহার, মোগলদের অপরাপর সুবা বা প্রদেশের

তুলনায় বাংলামুলুক থেকে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম খান স্বয়ং দিল্লি-তে গিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে সরাসরি নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, নাকি বিহারে থাকাবস্থায় সেটি হস্তগত করে বাংলার দিকে যাত্রা করেছিলেন? (এর আগে অবশ্য তিনি আগ্রায় ছিলেন বা গিয়েছিলেন), সেসম্বন্ধে *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* থেকে স্পষ্ট জানা যায়, তিনি দিল্লির দরবারে উপস্থিত হয়েই সম্রাট জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে নিযুক্তিসংক্রান্ত শাহি ফরমান হস্তগত করেছিলেন। অতঃপর তিনি যেটাই করে থাকুন না কেন, বাংলায় সেসময় যেহেতু বিদ্রোহী আফগানদের পাশাপাশি আরাকানি মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ-নিপীড়ন চলছিল, এবং এখানে কর্মরত সুবাদার মৃত্যুবরণ করবার ফলেই যেহেতু একজন অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও সম্রাটের বিপুল আস্থাভাজন তরুণ তুর্কি[৭০] হিসেবে তাঁকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেহেতু ধরে নেয়া সঙ্গত যে, তিনি নতুন দায়িত্বভার পাওয়ার একেবারে অব্যবহিত পরেপরে না হলেও অনতিবিলম্বেই বাংলার তথা তখনকার রাজধানী রাজমহলের দিকে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে সদল-বলে রওনা হয়েছিলেন।

এপ্রসঙ্গে ইংরেজ প্রশাসক-লেখক ব্রাডলী-বার্ট-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'Such was the position of affairs confronted Islam Khan on his appointment as Viceroy in 1608. In order to cope with the danger that beset Eastern Bengal, he at once resolved to take up his headquarters there, at the very centre of the scene of disturbance. Quitting his capital of Rajmahal, with all his court, he set sail for the eastern province.[৭১]

হান্টার এটা আরও স্পষ্ট করেছেন এভাবে: "The Muhammadan capital of Eastern Bengal was originally at SONARGAON ; but about 1608 the governor, Islam Khan, transferred the capital of the whole province from Rajmahal to Dacca, which was a convenient base for his operations against the Ahoms of Assam, and also against the Portuguese pirates who, in alliance with the Maghs or Arakanese, were then ravaging the waterways of the delta.[৭২]

দুই. একক সুবা হিসেবে বিহারের চেয়ে বাংলা ছিল আয়তনে অনেক বড় ও সম্পদশালী[৭৩], ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুবায় নিযুক্তি পেয়ে ইসলাম খান চিরাচরিত সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় দ্রুত সেটির মুখ্য নির্বাহীর দায়িত্বভার গ্রহণে অভিলষিত থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং যারা বলেন, ইসলাম খান ১৬০৭ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন; তাঁদের বক্তব্য অন্তত *মাসির-উল-উমারার* উদ্ধৃত তথ্য

থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যদিকে এটা *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* দ্বারাও সমর্থিত হয়। এতে পাচ্ছি: ''জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর মৃত্যু পর ইসলাম খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। শাহী ফরমান পেয়েই তিনি জানতে পারেন যে তাঁকে বাংলার সুবাদারের পদমর্যাদা দান করা হবে। তাই তা গ্রহণের জন্য তিনি সসম্ভ্রমে এগিয়ে যান। এই মহা অনুগ্রহের জন্য সম্রাটের কাছে আনুগত্য জানিয়ে তিনি তাঁর নিজ গৃহে ফিরে আসেন। সেখান থেকে তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী, একটি হস্তী বাহিনী এবং নৌবহর নিয়ে বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করেন।/ কয়েকদিন চলার পর তিনি এক শুভ মুহূর্তে আকবর নগর পৌঁছেন।"[৭৪]

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, ইসলাম খান ১৬০৮ সালের যে কোনো এক সময়ে বাংলায় এসে পৌঁছেছিলেন।

তিন. *মাসির-উল-উমারা* থেকে জানা গেল, ইসলাম খান কর্তৃক ওসমান খান ও তদীয় ভ্রাতা ওয়ালি খানকে সমূলে উৎখাত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করবার পরেই সম্রাটের (জাহাঙ্গির) সিংহাসনে আরোহণের সপ্তমবর্ষে তাঁকে ৬,০০০ মনসবে উন্নীত করা হয়েছিল।[৭৫] এই সপ্তমবর্ষ খ্রিস্টীয় হিসেবে দাঁড়ায় ১৬১২ অব্দ।

চার. ওসমান প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াই অবশ্যই প্রথানুযায়ী শুরু হয়েছিল তখনকার বাংলার রাজধানী আকবরনগর (রাজমহল) থেকে। তবে নানা কারণে রাজমহল থেকে এসব যুদ্ধাভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ইসলাম খানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণগুলোর মধ্যে মুখ্য, বাংলার আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় রাজমহল বাংলা সুবার অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল না, যেটা ছিল ঢাকা। রাজমহলের সন্নিকটে গঙ্গানদীতে চড়া পড়ায় এর প্রবাহ নৌ-চলাচলের বিশেষত মোগল নৌয়ারার যূথবদ্ধ অবস্থান ও সেখান থেকে ত্বরিৎ বা ঝটিকা অভিযানে বের হওয়ার পক্ষে উপযোগী ছিল না। বিপরীতে ঢাকাসন্নিহিত বুড়িগঙ্গা নদী ছিল এজাতীয় অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু যেহেতু আফগানদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ও সুসহনীয় ছিল এবং তাদের বিপুল ও শক্তিশালী অংশেরই অবস্থিতি ও বিচরণক্ষেত্র ছিল এদিকেই, সেহেতু ইসলাম খান ভালো করেই জানতেন, এদেরকে এবং মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের পরাস্ত ও সমূলে উৎখাত করতে হলে বাংলার পূর্বাংশেরই কোথাও তাঁকে রাজধানীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এজন্য সমকালে রাজমহল, তান্ডা, গৌড় প্রভৃতির বিকল্প তখন একমাত্র ঢাকাই ছিল।

এখন দেখা যাক, আকবরনগর বা রাজমহল থেকে কত দ্রুত সুবাদার ও তাঁর সৈন্যবাহিনী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তবে সে-স্থানান্তর একবারে হোক, কি কয়েকবারে (যেটা সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন)– সেটা এখানে বিবেচ্য নয়।

এব্যাপারে শুরুতেই দেখব নিয়োগকর্তা স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গির কী বলেছেন! *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি*-তে এসম্পর্কে পাই[৭৬]: "When I ascended the throne[৭৭], in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been governor of the country (*Bengal*), and appointed my *hokaltash* Kutub-ddin to succeed him. Soon after his arrival, he was assassinated by one of the turbulent characters of the country, who met with his reward and was killed. Jahangir Kuli Khan, whom I had made a commander of 5,000, was governor of the province of Bihar, and was near to Bengal, so I ordered him to proceed thither and take possession of the country. Islam Khan was then at Agra, and I sent a *farman* to him, granting him the province of Bihar in *jagir*, and directing him to proceed there. Jahangir Kuli Khan had not been long there when he fell ill, and died from the effects of the climate. On receiving intelligence of his death, I appointed Islam Khan to succeed him, and sent directions for him to proceed thither with all speed, leaving Bihar in charge of Afzal Khan."

পরবর্তী আলোচনার স্বার্থে, উদ্ধৃত অংশ থেকে শুধু এটুকু নিলেই চলে যে, সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পরে ইসলাম খান-কে অবিলম্বেই বাংলাভিমুখে ছুটতে হয়েছিল, কেননা সম্রাটের লিখিত নির্দেশ ছিল সেটাই– 'to proceed thither with all speed, leaving Bihar in charge of Afzal Khan.' কাজেই সম্রাটের লিখিত আদেশ পেয়ে তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। বরং নতুন গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অচিরেই।

এর ফল কী হয়েছিল, তাও সম্রাটের ভাষ্য থেকে শোনা যাক: "The result has been, that he has brought the country into a state of order, such as no one or his predecessors in the office had ever been able to accomplish. One of his most signal services has been the suppression of Usman the Afghan. During the reign of my father, the royal forces had continual encounters with this man, but were unable to subdue him."[৭৮]

বস্তুত দুর্ধর্ষ আফগান নেতা ওসমান প্রমুখকে ইসলাম খান পরাস্ত ও বিতাড়িত করে বাংলামুলুকে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে ঢাকাকে কেন্দ্রস্থল করেই, সেটিও সম্রাটের ভাষ্য থেকে উদ্ধারযোগ্য: "Islam Khan took up his quarters at Dacca, to bring the *zamindars* of that vicinity to submission, and

he formed the design of sending an army against Usman and his country, to induce him to make profession of allegiance, or else to exterminate him and his turbulent followers."[৭৯]

তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি থেকেও স্পষ্ট জানা যায়, এঅঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্রোহী জমিদারদের দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করবার পরই ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার কাজটা ঢাকায় স্থায়ীভাবে আস্তানা বা নিবাস গেঁড়ে তথা রাজধানী স্থাপনের পরই ইসলাম খান শুরু করেছিলেন।

তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরির ভাষায়, "When Islam Khan made Dhaka (Dacca) his place of abode and made the subjection of the Zamindars of that neighbourhood his chief object, it occurred to him that he should send an army against the rebel Usman and his province."[৮০]

সুবাদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির প্রায় প্রথমকাল থেকেই অর্থাৎ ১৬০৮ সালেই ঢাকায় এসে, ইসলাম খান-কে বুড়িগঙ্গার নদীর তীরে কৌশলগতভাবে সুরক্ষিত ও মজবুত ঘাঁটি তৈরি করে[৮১] বিভিন্ন যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও নানামুখী অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। কাজেই বলা চলে, ইসলাম খান কর্তৃক রাজমহল থেকে বাংলার তখনকার রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে এনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৬০৮ সালেরই কোনো এক শুভক্ষণে। স্বভাবত প্রচল নিয়মে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামে তিনি এটির নাম দিয়েছিলেন 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ'।[৮২] এখান থেকে পরিচালিত যুদ্ধাভিযান, তা যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, যেহেতু তা ব্যয়বহুল, শ্রমসাধ্য ও রক্তক্ষয়ী হতো, সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া চলে, ওসমান প্রমুখের পরাজয় একদিনে বা এক বছরে হয়নি, সেজন্য দীর্ঘ সময় বা কয়েক বছর লেগেছিল। আর এ-কালপরিসরে যুদ্ধ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নতুন রাজধানীটিকে প্রয়োজন ও সাধ্য মতো সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

যাই হোক, এবারে বক্তব্য সংক্ষেপ করে বলতে পারি যে, *মাসির-উল-উমারা* মতে যেহেতু জাহাঙ্গিরের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে অর্থাৎ ১৬০৮ সালে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি* মতে নিযুক্তির অচিরকাল মধ্যে তাঁকে নতুন সুবায় যোগদান এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহী আফগান ও মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের দমনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল, সেহেতু এই দুরূহ কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন সুবে বাংলার তুলনামূলকভাবে মধ্যবর্তী স্থল বা ঢাকায় ('ঢাকা বাজু'-তে) রাজধানী স্থাপন করে। এজন্য নদী হিশেবে বুড়িগঙ্গার যে-বিশেষ অবদান বা ভূমিকা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। কেননা আমরা আগেই দেখিয়েছি, নদীখাত পরিবর্তন এঅঞ্চলের বহু প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ রাজধানী পরিত্যক্ত হওয়ার পিছনে প্রবল ক্রীড়নকের কাজ করেছে। স্মর্তব্য, এসময় ঢাকাসংলগ্ন

বুড়িগঙ্গানদীকেন্দ্রিক নৌপথে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। আবদুল করিমের ভাষায়, 'As this (*Dhaka*) place, was connected with all parts of Bengal through a network of rivers, it proved to be an ideal capital. The potentiality of Dhaka as a capital city has been tested from time to time,..'[৮৩]

এসত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, আকবরনগরে বা রাজমহলে তিনি কিছুকাল বা বছরখানেক অবস্থান করবার পরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ঢাকায়, এবং সেটা একবারে বা পর্যায়ক্রমে, তবু সেক্ষেত্রেও সেসময়টা তাঁর নতুন দায়িত্ব লাভের পরে এক বছরের বেশী বর্ধিত করা সঙ্গত মনে হয় না, অর্থাৎ বড় জোর ১৬০৯ সালে। ফলত রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে স্পষ্টত উল্লেখ করা হলেও, যেহেতু তার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বা বছর এখনপর্যন্ত প্রাপ্ত বা লভ্য কোনো সূত্রেই বর্ণিত হয়নি, এবং যদি ধরেও নেয়া হয় যে, *তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি*-তে সম্রাট স্বীয় রাজ্যবর্ষের যে-ক্রমে ('The Seventh New Year's Festival after the Auspicious Accession') এ-ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন, সেটিকেই রাজধানী স্থানান্তরের বছর বিবেচনা করা উচিত, তা হলে খ্রিস্টাব্দের হিসেবে সেটি দাঁড়াবে (১৬০৫+৭) = ১৬১২। *Memoirs of Gaur and Pandua*-র লেখক এম. আবিদ আলি খান এই সন-টিই স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, "When Islam Khan was the Subadar of Bengal the seat of Government was transferred to Dacca about 1612. The main reasons for this removal was (*were*) to deal with a fresh Afghan rebellion under Usman, as well as to check incursions by the Arakanese."[৮৪]

The History of Bengal (Vol. II)-এ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The establishment of the capital at Dacca by Islam Khan early in April, 1612, was an event of great importance in the history of Mughal rule in Bengal."[৮৫]

জেমস টেইলর, গ্লাডউইন-সূত্রে বলেন, ১৬১২ সালে ইসলাম খানের প্রেরিত দুর্ধর্ষ মোগল সেনাপতি সুজায়েত খান ও ইতিমাম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং ওড়িশার সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী স্থানে ওসমান খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে বিজয়ের পরই রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়েছিল।

তাঁর ভাষায়, '...until 1612, when after a long contested battle on the banks of the Subanreeka in Orissa, he (*Osman Khan*) was slain, and his army defeated by Shujaet Khan and Ethamam Khan, two

Mogul Officers, who had been sent by Islam Khan, the Governor of the Province. Gladwin states, that it was after this victory, that Islam Khan removed the seat of Government, from Rajmahal to Dacca. This is about four years later than the date assigned by Stewart,..'[৮৬]

এ. এল. ক্লে-র বক্তব্যও তাই। তাঁর মতে, "On the Emperor Akbar's death in 1605, Asman Khan, one of their (*Afghans'*) Chiefs, collected an army of 20,000 men and was proclaimed King. He overran the lower part of Bengal, and maintained his position till 1612, when he was defeated and slain in a decisive engagement in Orissa with the Mogul forces. At this time Islam Khan was Governor of the Province; and after this victory he is said to have removed the seat of Government from Rajmahal to Dacca. Stewart, in his History of Bengal, says that this event took place four years earlier, and mentions a descent by the Mughs upon the coast as the probable cause of the transfer."[৮৭]

আধুনিককালের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদদের মধ্যে রিচার্ড এম. ইটন[৮৮], তপন রায়চৌধুরী[৮৯] প্রমুখ মনে করেন, ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১২ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য, সাবেক পূর্বপাকিস্তান এবং স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রযত্নে প্রকাশিত যথাক্রমে *East Pakistan District Gazetteers: Dacca*[৯০] এবং *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ঢাকা জেলা*[৯১]-এ এপর্বের ঢাকার রাজধানী হওয়ার সময় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল বলে বর্ণিত হয়েছে।

যাই হোক, সার্বিক বিবেচনায় সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ফারুকি কর্তৃক মধ্যকালীন তথা মোগল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় এবং এবিষয়ে হান্টার, অ্যালেন, দানী প্রমুখের মতটিকেই আমরা গ্রহণ করবার পক্ষপাতী।

সুবাদার মিরজুমলা

শাহজাহানের সিংহাসনলোভী বিবদমান পুত্রগণের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির একটি উত্তরাধিকারিত্বের দ্বন্দ্ব। ভাইদের মধ্যেকার এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুহম্মদ শাহসুজাকে শেষপর্যন্ত আরাকানে সপরিবারে পালাতে বাধ্য করবার মধ্য দিয়ে বীর সেনাপতি মিরজুমলা, বিজয়ী আওরঙ্গজেবের প্রতি যে-অপরিসীম প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং স্বীয় অধীনে

থাকা সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় যে সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাতেই মন জিতে নেন তিনি নতুন সম্রাটের অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের। স্বভাবত যারপরনাই প্রীত সম্রাট তাঁকে 'খান-ই খানান' ও 'সিপাহ্‌সালার' খেতাব, বিশেষ 'খেলাত', স্বর্ণখচিত তরবারি এবং তাঁর 'মনসব' ৭,০০০-এ বাড়িয়ে সম্মানিত এবং সেইসঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের ধনৈশ্বর্যপূর্ণ প্রদেশগুলোর অন্যতম সুবে বাংলা শাসনের ভার অর্পণ করেছিলেন। মিরজুমলা ১৬৬০ সালের ৯ই মে জাহাঙ্গিরনগরে তথা ঢাকায় পদার্পণ করেন। ফলত এভাবেই শুরু হয়েছিল বাংলায় নিযুক্ত মোগল সুবাদারদের মধ্যে সবচেয়ে কীর্তিমান, শক্তিমান ও প্রভাবশালী দুই শাসনকর্তার একজনের কার্যকাল। প্রসঙ্গত অন্যজন নবাব শায়েস্তা খান।

মিরজুমলার যুগেই দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা পায় ইতিহাসে তার সবচেয়ে কীর্তিময় স্থানটি অর্থাৎ রাজধানী হওয়ার পুনঃ মর্যাদা। এ. এল, ক্লে চমৎকার বলেছেন, "We now come to the Viceroyalty of Meer Jumla, who, at his accession in 1660, once more made Dacca the seat of Government. This was perhaps the most flourishing era in the history of Dacca."[৯২] লক্ষণীয় যে, মুনিম খান থেকে শুরু করে মিরজুমলা পর্যন্ত বেশ কয়েক জন খ্যাত-নিমখ্যাত মোগল সুবাদার তান্ডা, রাজমহল ও ঢাকা– এ তিনটিকে রাজধানী করে বাংলামুলুক শাসন করেছিলেন; তবে এঁদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের জীবৎকাল পর্যন্ত ইতিহাসে স্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে পেরেছেন মূলত মিরজুমলাই, এবং তাঁর পরে শায়েস্তা খান, এবং অংশত মুর্শিদকুলি জাফর খান নাসিরি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পরবর্তী কালে, সেজন্য তিনি নিজ সুবাদারি-ক্ষমতা প্রয়োগও করতে পেরেছিলেন অনেকটা স্বাধীনভাবে ও স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কের ন্যায়। আর এজন্যই তাঁকে বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব বলে অনেকে আখ্যায়িত করেন।[৯৩] তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার-নবাবগণ এই প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কখনই ভোগ করতে পারেননি, তা বলাইবাহুল্য। ফলে তাঁদের কঠোরভাবে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগাধিকারের মধ্যে যেসব ভালো ও জনকল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন, সেজন্যই তাঁদের অনেকের নাম-কীর্তি আজও স্মরণীয়। কাজেই আমাদের আলোচ্য ঢাকার অনুরূপ প্রসঙ্গ যেখানে জড়িত, সেখানে মিরজুমলা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

বাংলায় তাঁর সুবাদারিকাল মোটামুটি ৩-বছরের মতো, সুনির্দিষ্ট করে বললে ৯ই মে ১৬৬০ থেকে ৩১শে মার্চ ১৬৬৩ পর্যন্ত। এই মেয়াদের প্রায় শুরুতেই তিনি বাংলার তখনকার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে এনেছিলেন। স্মর্তব্য যে, ইতোমধ্যে এটি শাহজাদা মুহম্মদ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে ঢাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন (১৬৩৯)। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এবারও মিরজুমলা কর্তৃক

রাজধানী স্থানান্তরের পশ্চাতে ছিল সেই চিরাচরিত ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক কারণ–দৃশ্যত রাজমহলের কাছে গঙ্গার খাত বা প্রবাহ পরিবর্তন; এছাড়াও ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত জগদ্বিখ্যাত ফরাসি পরিব্রাজক জাঁ ব্যাপ্তিস্তে টাভার্নিয়ের এব্যাপারে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়: "Rajmahal is a town on the right bank of the Ganges, and when you approach it by land you find that for one or two coss the roads are paved with brick up to the town. It was formerly the residence of the Governors of Bengal, because it is a splendid hunting country, and, moreover, the trade there was considerable. But the river having taken another course, and passing only at a distance of a full half league from the town, as much for this reason as for the purpose of restraining the King of Arakan, and many Portuguese bandits who have settled at the mouths of the Ganges, and by whom the inhabitants of Dacca, up to which they made incursions, were molested—the Governor and the merchants who dwelt at Rajmahal removed to Dacca, which is to-day a place of considerable trade."[৯৪]

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কারণে মিরজুমলার রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে আনবার বিষয়টি আধুনিক ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছেন। যেমন তাঁর আধুনিক জীবনীকার জগদীশ নারায়ণ সরকার লিখেছেন, "Mir Jumla transferred the capital of Bengal from Rajmahal to Dacca out of several considerations, foremost among which was the need of keeping the Arakanese and the Portuguese pirates in check."[৯৫]

বস্তুতপক্ষে রাজধানী স্থানান্তরের এ-কাজটি যে তিনি ঠিকই করেছিলেন এবং এতে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল, বিশেষত তখনকার ঢাকা যে রাজমহলের তুলনায় সবদিক থেকেই ছিল রাজধানী হওয়ার মতো উপযুক্ত, সেসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী পাওয়া যায় এপর্বে বাংলায় আগত ইউরোপীয় নাবিক ক্যাপ্টেন টমাস বাউরে (Thomas Bowrey)-র ভ্রমণলিপিতে। স্বীয় *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*-তে তিনি লিখেছেন (তাঁর প্রাচীন বানান অপরিবর্তিত): "Emir Jemla hath now the Government of Bengala, Orixa, and Pattana, firmly by Phyrmand Setled Upon him with an absolute Power and title of Nabob. Hee makes Dacca the Metropolitan, beinge a fairer and Stronger Citty

then Radja Mehal, the antient Metropolis, the Kingdoms wholy Submittinge to him,..."[৯৬]

বাউরে ঢাকা নগরীর বিশালত্ব, এর অনিন্দ্যসুন্দর হর্ম্যরাজি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধেও তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

"The Citty Dacca is a Very large spacious one, but standeth Upon low marshy Swampy ground, and the water thereof Very brackish, which is the onely inconvenience it hath, but it hath some very fine conveniencies that maketh amends, haveinge a fine and large River that runneth close by the walls thereof,...this Citty, for it is not lesse in Circuit then 40 English miles./ An admirable Citty for it's greatnesse, for it's magnificent buildings, and multitude of Inhabitants. A very great and Potent army is here in constant Sallary and readinesse, as alsoe many large, Stronge, and Stately Elephants, trained Up for a Warlike Service, which are kept continually neare to the Pallace."[৯৭]

তাঁর বিবেচনায়, তখন সমগ্র বাংলায় ঢাকার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ('The Second best Citty') ছিল 'কটক'।[৯৮]

টাভার্নিয়েরও ঢাকানগরী সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য চাক্ষুষ বর্ণনা রেখে গেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রাপথে রাজমহল থেকে রওনা হয়ে তিনি দৌল(ত)দিয়া, কাজিহাটা, লক্ষ্যা, পাগলা, কদমতলি হয়ে সঙ্গিগণসহ যখন ঢাকায় পৌঁছেছিলেন, তখন ছিল প্রদোষকাল, আর তিনি যা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন[৯৯]:

"We arrived at Dacca, towards evening, and accomplished this day 9 coss. Dacca is a large town, which is only of extent as regards length, each person being anxious to have his house close to the Ganges. Its length exceeds 2 coss ; and from the last brick bridge, which I have mentioned above, up to Dacca, there is a succession of houses, separated one from the other, and inhabited for the most part by the carpenters who build galleys and other vessles. These houses are, properly speaking, only miserable huts made of bamboo, and mud which is spread over them. Those of Dacca are scarcely better built, and that which is the residence of the Governor is an enclosure of high walls..."

তাঁর এ-চমৎকার বর্ণনায় তখনকার ঢাকানগরীর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো ও এর শহরতলির দৃশ্যই চিত্রায়িত।

ঢাকায় যে এসময় বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর ইমারত এবং বিলাসব্যসনে বাস করবার উপযুক্ত ভবনাদি ছিল, তার আরও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি ভূ-পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের-এর ভ্রমণপঞ্জি থেকে। প্রসঙ্গত সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য যখন বেশ বেড়েছিল এবং তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেসময় এই নিষ্ঠুর জলদস্যুদের একটা দল আরাকান রাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে অপহরণ করে। আর এরকমই এক ঝটিকা আক্রমণকালে দস্যুরা যখন বহির্গত হয়েছিল তখন সম্ভবত তাড়াহুড়ার কারণে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে সঙ্গে নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। পরে ভ্রাম্যমাণ মোগল সৈন্যরা এই 'অসাধারণ অতিথিদের'কে উদ্ধার করে রাজধানীতে নিয়ে এলে স্বয়ং সুবাদার তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রভূত উপঢৌকনাদি প্রদান এবং তাদের মনোরম আবাসে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বস্তুত এভাবেই শায়েস্তা খান হন্তারক দস্যুদের মন জয় এবং তাদেরকে নিজের অনুগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনারই প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন বার্নিয়ের: "*Chah-hestkan* received these extraordinary visitors with open arms, gave them large sums of money ; provided the women and children with excellent accommodation in the town of Daka, and after he had thus gained their confidence, the pirates evinced an eagerness to act in concert with the *Mogol's* troops,..."[১০০]

সুতরাং উপরের এসব প্রত্যক্ষ দর্শনজাত অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সহজেই ধারণা করা চলে, মোগলযুগের ঢাকায় ততদিনে প্রচুর সরকারি ইমরাত ও বেসরকারি বা ব্যক্তিগত ছোট-বড় ভবনাদি নির্মিত হয়েছিল। তবে উঁচু, বড় ও সুদৃশ্য হর্ম্যনিচয়ের পাশাপাশি অনেকানেক পর্ণ-কুটিরও ছিল।

এপ্রসঙ্গে নিকোলো মানুচ্চি-র বর্ণনা উদ্ধার করা যায়। তাঁর ভাষ্যে এসময়কার ঢাকা-কে পাওয়া যায়: "From Rajmahal I continued my journey on the river to the city of Daca (Dhakah), which was reached in fifteen days from leaving Rajmahal. The city of Dhakah is the metropolis of the whole province of Bengal, where a viceroy always resides who wields the greatest power, although when I reached it Mir Jumlah, the then viceroy, was not there, he having gone to make war on

Assam....The city of Dhakah, without being strong or large, has many inhabitants. Most of its houses are made of straw."[১০১]

এসময় ঢাকায় ইংরেজ[১০২] ও ডাচ বা ওলন্দাজ[১০৩] বণিকদের কুঠিবাড়ি বা ফ্যাক্টরি ছিল, ছিল বহু খ্রিস্টান পরিবার ও পাদরির বাস, যাদের অনেকে ছিল শ্বেতকায় ও কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের পোর্তুগিজ এবং ছিল 'অগস্টিনহো' (Agostinho) নামীয় একটি চার্চ বা গির্জা।[১০৪] টাভার্নিয়ের জানাচ্ছেন, এটি ছিল– 'The church of the Rev. Augustin Fathers', যা ছিল পুরোপুরি ইটে তৈরী ও আকর্ষণীয় কারুকার্যখচিত। অন্যদিকে ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত *XVII.—DACCA RECORDS* শীর্ষক বালাম থেকে জানা যায়, সতেরো শতক নাগাদ ঢাকা শহরে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ ছাড়াও ফরাসিদেরও উপস্থিতি ছিল।

"Dacca [Dakha, and also called from the *dakh*, or Butea frondosa, trees of the neighbourhood] was occupied by flourishing Dutch, English, and French factories in the 17th century."[১০৫]

এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা যায় যে বস্তুত মৌর্য, গুপ্ত, সুলতানি, মোগল, নবাবি, ইংরেজ, পাকিস্তানি অর্থাৎ এককথায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক– এই তিনযুগেই বাংলা-বহির্ভূত বিভিন্ন দেশি-বিদেশি রাজবংশের শাসনকালে পূর্ববঙ্গ থেকে যে সুপ্রচুর অর্থ বিভিন্নভাবে– কখনও রাজস্ব, কখনও উপঢৌকন, কখনও সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নামে-আকারে-প্রকারে কখনও মগধ-পাটলীপুত্র, কখনও দিল্লি-আগ্রা, লন্ডন-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা-করাচি প্রভৃতি স্থানে চলে যেত, তার প্রমাণ আমরা মিরজুমলার যুগেও পাই।

বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি প্রেরণ করেছিলেন পারস্যে তথা আজকের ইরানে। সম্রাটের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ভয়ে এ-অর্থ অবশ্য ঢাকা থেকে পাচার করা হয়েছিল সেখানে অবস্থানকারী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ব্যয়ভার বহন বা তাদেরকে সাহায্য করবার নামে বা অজুহাতে। এসম্পর্কিত এক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় শয়খ ফরিদ বখারি রচিত *দাখিরাতুল খাওয়ানিন* নামক গ্রন্থে। তবে এ-মুসলিম ঐতিহাসিক ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য কি-না, সেব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তাঁর ভাষায়: "Mir Jumla Isfahani :...During the Dakan famine, he made name in generosity...But the Irani people (in India) say that the generosity of the Mir was not innate. He has many sons and grandsons in Iraq (*i.e.,* Iran); every year, he sent for them two lakh rupees, but here in office documents, that amount was shown (by him) under the head of charity, fearing lest this matter (of sending money abroad) reached the august ears (of His Majesty). So, the descendants of

that late one (*i.e.,* Mir), constructed (with that money) a number of mansions in Isfahan and purchased sarais, gardess, water mills hospices and properties. God knows the truth and falsehood! In any case, in the scarcity of grain, when corn was two seers a rupee, he gave alms in abundance and the whole world (of people) received bounty from him."[১০৬] বলাবাহুল্য, ঢাকাসহ বিশেষত পূর্ববাংলার ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর-জাত আয় থেকেই হতো তাঁর এই দরাজহস্তের দান-দক্ষিণা, আত্মীয়স্বজন-হিতৈষণা।

সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর[১০৭] তাঁরও প্রথম ও মুখ্য কর্তব্য দাঁড়ায় বর্বর আরাকানি মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদেরকে বাংলা থেকে যে কোনো উপায়ে বিতাড়ণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী-গরিব সব শ্রেণীর মানুষের মনে স্থায়ী স্বস্তি ফিরিয়ে আনা।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বলেন, "The deliverance of *Bengale* from the cruel and incessant devastations of these barbarians was the immediate object of the expedition contempleted by *Chah-hestkan* upon his appointment to the government of that Kingdom."[১০৮]

তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়েও এনেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর কালে বাংলায় টাকায় ৮ (আট) মণ চাল পাওয়া যেত, এর সপক্ষে যুক্তি খাঁড়া করা চলে এভাবে যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর-হৃদয়[১০৯] ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, এবং একইসঙ্গে দীন-দুঃখীর প্রতি দয়ালু ও তাদের শেষ আশা-ভরসার স্থলস্বরূপ। বস্তুত সকলেই যে তাঁর শাসনামলে কম-বেশি সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল, তা জানা যায় পূর্বোক্ত *দাখিরাতুল খাওয়ানিন*-এর এক বর্ণনা থেকে, যা এরকম:

"Nawwab Shaista Khan, son of Asaf Khan:..his august mansab is 5,000 person and horse and he is the governor of Dakan province where 1,700 illustrious *mansabdars* obey his order and (submit to his) dictates...All the mansabdars of this province, from low and high or young and old, are happy and contended with him. Whosoever cherishes whatever desire, he can refer his requirement without the intermediary of any one else to him at his court and attain his heart's wish."[১১০]

তাঁর আমলে সুবে বাংলার ক্রমসজ্জায়মান রাজধানী-নগরী ঢাকা যে আয়তনে যথেষ্ট বেড়েছিল, অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন হর্ম্যরাজিতে, ফুলশোভিত বাগ-বাগিচায়, বাজার-গঞ্জে-

চকে এবং সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় ও আবাস-সন্ধানী মানুষের নিত্য পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ. এল. ক্লে জানাচ্ছেন: "Shaista Khan is also the reputed founder of several large mosques and other buildings, which are now in ruins. (This ruler appears to have encouraged architecture. A style of building prevalent in the city is still called "Shaista Khani.") During his administration the city and suburbs extended to the northward as far as Toonghee, a distance of some fourteen miles, the greater part of which is now covered with jungle."[১১১]

মোগল স্থাপত্যরীতিতে ঢাকায় পাকা ইমারত ও স্থাপনা যেমন দুর্গ, মসজিদ, সুবাদার ও উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদের বাসভবন, ঈদগাহ, ফটক প্রভৃতি নির্মাণের কাজ ঢাকার দ্বিতীয়বার রাজধানী হওয়ার পরই মূলত ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। ১৬৭৮ সালে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুবাদার মুহম্মদ আজম ঢাকার বিখ্যাত 'লালবাগ দুর্গ' তৈরির কাজ শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। এটিকে কেন্দ্র করেই লালবাগ দুর্গ-চত্বরে শায়েস্তা খান তদীয় প্রিয়, মৃতা কন্যা পরীবিবি (সুবাদার আজমের স্ত্রী)-র স্মৃতিরক্ষার্থে একটি চমৎকার সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। একইভাবে আজিম-উশ-শানের আদেশে মীর আবদুল কাসিম খান ঢাকার বিখ্যাত 'বড় কাটরা' তৈরি করেন। এরই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ নির্মিত হয় শায়েস্তা খানের আমলে 'ছোট কাটরা' নামে। জানা যায়: "Small Katra (caravanserai): This was built by Amirul Omrah, Nawab Shaista Khan,...as Viceroy of Bengal. It is said that it was intended for a caravanserai and was built some years after the great Katra, but the exact year is not known. It looks well from the river having one fine doorway facing in that direction."[১১২]

উপসংহার

ইসলাম খান, মিরজুমলা ও শায়েস্তা খান– এই সুপ্রসিদ্ধ সুবাদারত্রয়ীর গড়ে তোলা রাজধানী ঢাকা থেকে দিওয়ান কারতলব খান ১৭০৩[১১৩] বা ১৭০৪ সালে[১১৪] সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে সুবে বাংলার দিওয়ানি বিভাগসহ আনুষঙ্গিক দপ্তরাদি অর্থাৎ রাজধানীতে অবস্থিত প্রায় অর্ধেক প্রশাসনযন্ত্র যখন 'মুকসুসাবাদ' বা 'মুকসুদাবাদে'[১১৫] স্থানান্তরিত এবং তার নাম দেন স্বীয় নামানুসরণে 'মুর্শিদাবাদ', এবং পরে (১৭১৭) স্বয়ং তিনিই যখন সুবাদার হন[১১৬], সুবাদারি প্রশাসনের তথা নিজামতেরও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দপ্তর নতুন কর্মস্থলে নিয়ে যান[১১৭], তখন সঙ্গত কারণে পরিত্যক্ত রাজধানী অর্থাৎ ঢাকার শান-শওকত ম্লান হতে শুরু করেছিল। আবদুল করিমের ভাষায়, "Dacca was thus deprived of the

presence of the *subahdar* and henceforth the centre of gravity shifted to Makhsusabad, first the seat of the *diwani*, but some years later the seat of the provincial governmenr also."[১১৮]

মুর্শিদকুলির যুগ তাই ঢাকার জন্য এক কালো অধ্যায় বললে ভুল বা অত্যুক্তি হয় না। কেননা একটি দ্রুত বিকাশ- বা স্ফুটমান রাজধানীর যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলে তিনি তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করেছিলেন। ফলত তাঁর পরবর্তী নবাব-নাজিমগণও যেহেতু মুর্শিদাবাদকে রাজধানী রেখেই, সেখানেই একের পর এক বিপুল বিলাস-ব্যসনে মজে রাজত্ব করে গেছেন, সেহেতু সঙ্গত কারণে এটিকেই তাঁরা নানাভাবে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করেছেন।

অন্যদিকে আগে যেমন কোনো সুবাদার বদলি হলে এবং তার স্থলে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর কারোর আবির্ভাব ঘটলে নবাগত জন এসেই সেটা পরিবর্তন করে নতুন স্থানকে রাজধানী নির্বাচন করতেন, কিন্তু সেই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া মুর্শিদকুলির পরে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তাঁর পরেও বাংলা, বিহার ও ওড়িশার আরেকজন খুব প্রভাবশালী এবং দিল্লি-আগ্রার অধীনতামুক্ত ব্যক্তি নবাব-নাজিম হয়েছিলেন, তিনি আলিবর্দি খান (১৭৪০-৫৬); তাঁরও রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। তাঁর পরে তদীয় দৌহিত্র ও বাংলার 'শেষ স্বাধীন' নবাব তরুণ, অনভিজ্ঞ সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭) তো দেশি-বিদেশি নানা সুযোগসন্ধানী কুশীলবদের ষড়যন্ত্রে প্রাণই বিসর্জন দিলেন মুর্শিদাবাদে। ফলে এঁদের সময়ে ও পরবর্তী বেশ কিছুকালও বাংলার প্রধান শহর বা রাজধানী নগরীর যা কিছু ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, তার সবকিছুই মুর্শিদাবাদকে ঘিরেই পরিকল্পিত, রচিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

এদিকে নবাবি-উত্তরপর্বে, ইংরেজযুগে বিশেষ করে মহাদুর্ভিক্ষ উত্তরকালে এমনও দেখা গেল যে, একদা বিপুল জনবসতিপূর্ণ ঢাকা নগরী অনেকটা বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

তবে আশার কথা, সে-অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ইতিহাসের অমোঘ কালচক্রে ধীরে ধীরে ঢাকা ফিরে পেতে শুরু করেছিল তার পুরোনো দিনের ঐতিহ্য, হৃত গৌরব। সত্যি বলতে, বিশ শতকের সূচনাই হয়েছিল ঢাকার ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় দিয়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের ন্যায় রাজধানী হয়েছিল ঢাকা, যদিও দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের একাংশের। অন্য অংশের রাজধানী তখন কলকাতা। কিন্তু মাত্র অর্ধযুগ স্থায়ী হয়েছিল এটা। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে ঢাকা থেকেই শুধু রাজধানী স্থানান্তরিত হয়নি, ততদিনে কলকাতাও হারিয়েছিল সে-মর্যাদা (১১৯২); যা আর কখনই ফিরে পায়নি সে, পেয়েছে ঢাকা।

তবে সে-ইতিহাস ভিন্ন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, L. S. S. O'Malley, p. 24.

২. পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গাবংশীয় রাজাদের একসময়কার রাজধানী ছিল 'কটক' (ওড়িশা)। ১৮০৩ সালে ইংরেজ অভিযান ও তা অধিকৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত কটকের এ-মর্যাদা অটুট ছিল।

৩. মগধ বা বিহার ছিল পালরাজাদের যুগে বৃহত্তর বাংলার রাজধানী। [দেখুন, *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 24)]; *The Ancient Geography of India*, Alexander Cunningham, pp. 381-83.

৪. রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর নামীয় মুসলিম বিজয়-পূর্ব বাংলার রাজধানী।

৫. *আইন-ই-আকবরি*-তে এটি সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, "*Jannatabad* is an ancient city : for a time, it was the capital of Bengal and was widely known as Lakhnauti and for a while as Gaur. His Majesty the late Emperor Humayun distinguished it by this title of Jannatabad." (দেখুন, Abul Fazl Allami's *The Ain-I Akbari*, Vol. II., Translated by Colonel H. S. Jarrett & further annotated by Sir Jadunath Sarkar, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1978, p. 135).

৬. *Calcutta in the Olden Time: Its Localities & Its People*, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1974, p. 2.

৭. বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক তৎকালীন সেনরাজা লক্ষ্মণসেন এখান থেকেই বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৮. *Memoirs of Gaur and Pandua*, Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Edited & Revised by H. E. Stapleton, Bengal Secretariat Book Depot, 1931, p. 17.

৯. *Early Travels in India, 1583-1619*, Edited by William Foster, Oriental Books Reprint Corporation, 1985, p. 28, see fn.

১০. *Sonargaon-Panam: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh*, Edited by A. B. M. Husain and Others, The Asiatic Society of Bangladesh, 1997, p. 1; এপ্রসঙ্গে আরও দেখা যায়, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, আবদুল করিম; *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)*, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৮।

১১. *Early Travels in India, 1583-1619*, p. 28.

১২. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 17.

১৩. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18; *The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period (1200—1757)*, Edited by Sir Jadu-Nath Sarkar, The University of Dacca, 1972, p. 182.

১৪. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18; *Bengal under Akbar and Jahangir: An Introductory Study in Social History*, Tapan Raychaudhuri, Munshiram Manoharlal Publishers Private Limited, Delhi, 1969, p. 50.

১৫. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18.

১৬. আজিম-উশ-শান বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে রাজধানী প্রথমে রাজমহলে (১৭০৩) এবং পরে পাটনায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষোক্ত স্থানের নাম দেন স্বীয় নামে 'আজিমাবাদ'। (দেখুন, *Murshid Quli Khan and His Times*, Abdul Karim, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963, p. 22; *Bengal in the Reign of Aurangzib, 1658-1707*, Anjali Chatterjee, Progressive Publishers, 1967, p. 35).

১৭. *The Seir Mutaqherin; or Review of Modern Times*, Seid–Gholam-Hossein-Khan, Vol. II, R. Cambray & Co. pp. 431-32; *Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal)*, Ghulam Hussain Salim, Translated by Abdus Salam, Idarah-I Adabiyat, Delhi, 1975, pp. 385-97.

১৮. মধ্যযুগে এককভাবে সুবা ওড়িশার রাজধানী ছিল মূলত জাজপুর ও ভুবনেশ্বর। [দেখুন, *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 25]. আরও দেখুন, *An Account (Geographical, Statistical, and Historical) of Orissa Proper or Cuttack*, A. (Andrew) Stirling, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1904.

১৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *The Delhi Omnibus*, Oxford University Press, 2002.

২০. ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের রাজধানী হিসেবে কলকাতা অবশ্য এখনও বর্তমান।

২১. *Sylhet' Thackeray*, Bradley-Birt, F. B. (Francis Bradley), pp. 86-90.

২২. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, A. L. (Arthur Llyod) Clay, 1867, p. 33.

২৩. *ঢাকা : পঞ্চাশ বছর আগে*, মূল হাকীম হাবীবুর রহমান, ভাষান্তর মোঃ রেজাউল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১।

২৪. *কালের সাক্ষী ঢাকা*, অনুবাদ আবু জাফর, পৃষ্ঠা ১১; এর মূল দেখুন, *Dacca : A Record of Its Changing Fortune*, Ahmad Hasan Dani, Dacca, 1962, p. 17.

২৫. 'দবাক' 'বা 'ডবাক' শব্দটির সঙ্গে আসামের নওগাঁও বা নওগাঙ জেলার অনুরূপ শব্দটির সাদৃশ্যসম্পর্কিত মত মুদ্রাতত্ত্ববিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও। [দেখুন

তাঁর, *Coins and Currency System in Gupta Bengal, (c. A. D. 320-550)*, B. N. (Bratindra Nath) Mukherjee, Harman Publishing House, New Delhi, 1992, p. 21]. তবে শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্রাট শশাঙ্কের সময়কার আবিষ্কৃত মুদ্রার ভিত্তিতে ঢাকার প্রাচীনত্বের কিছু যোগ পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "Similar coins have been reported as chance-finds in different localities, mainly within the old limits of the Dacca and Comilla districts. The names of the old Jessore, Faridpur and Bogra districts and Tripura can also be mentioned in this connection. One piece was found together with a coin of Sasanka and another of Samacharadeva and a few specimens of Gupta silver coinage in a hoard unearthed near Muhammadpur in the old Jessore district." [দেখুন তাঁর, *Coins and Currency Systems of Post-Gupta Bengal (c. AD 550-700)*, Munshiram Manoharlal Publishers Private Limited, Delhi, 1993, p. 20]। অন্যদিকে ভি. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ 'দবাক' শব্দ দ্বারা আসামের কথিত স্থানটি ছাড়াও এর সঙ্গে ঢাকা-কেও যুক্ত করবার পক্ষপাতী। তাঁর ভাষায়, "Line 22 of the Allahabad Pillar Inscription throws welcome light on Samudragupta's relations with his frontier kingdoms. This part of Harisena's inscription helps us to define with accuracy the limits of the Gupta empire under Samudragupta.../On the east, these states were: (1) Samatata which consisted of the valley of the Brahmaputra. Later on the emperor found the necessity for a natural outlet to the sea and make this a part of the province of Champa. (2) Kamarupa or the province of Assam, (3) Davaka which represents the territory bounded by the Khasi Hills on the north, Meghna on the east, the Ganges on the south and Karatoya on the west. This kingdom also included Dacca and Sunargaon." (দেখুন তাঁর, *The Gupta Polity*, V. R. Ramachandra Dikshitar, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1993, pp. 80-81). অর্থাৎ এ-বর্ণনা থেকে ঢাকার প্রাচীনত্বের প্রসঙ্গ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

২৬. *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫১২।*

২৭. p. 30.

২৮. *The History of Indian Literature*, Translated by John Mann & Theodor Zachariae, Trubner & Co., 1882, p. 200.

২৯. p. 200.

৩০. *A History of Sanskrit Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., Ltd., 1972, p. 364.

৩১. *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫০২।

৩২. *মোগল রাজধানী ঢাকা*, আবদুল করিম, অনুবাদ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২২।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২। এবিষয়ে মুহম্মদ এনামুল হকও প্রশ্ন তুলেছেন, "খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্ত-বংশের রাজত্বকালে 'মগধ'-সহ বঙ্গদেশ আর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট, কামরূপ ও ডাবক (Davaka) দেশের লোক সম্রাটকে করদান করত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'ডবাক' কি ঢাকা?" (দেখুন, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৯৮)।

৩৪. UNESCO প্রকাশিত *The Islamic Heritage of Bengal* গ্রন্থে ঢাকায় সুলতানিযুগের এরূপ ৮টি মসজিদের কথা বলা হয়েছে। (দেখুন, ঐ, pp. 179-92; আরও দেখুন, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal*, Syed Mahmudul Hasan, The University Press Limited, 1979).

৩৫. *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, Edited and translated by Shamsud-Din Ahmed, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, pp. 62-4; *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Abdul Karim, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, pp. 134-7. আরও দেখা যেতে পারে, *Muslim Architecture in Bengal*, Ahmad Hasan Dani, 1961, pp. 191-93; *Dacca : The City of Mosques*, Syed Mahmudul Hasan, pp. 31-3.

৩৬. এবিষয়ে এইচ. (এফ.) ব্লকম্যান তাঁর *Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammedan Period)* এর পাদটীকায় (p. 8) যা লিখেছেন তা প্রচুর তথ্যবহুল হওয়ায় এখানে তুলে ধরা হলো: "Stewart says that Dhaka is a modern town, "because the name does not occur in the Ain." But it does; *vide* my text edition, p. 407, where the Mahall to which it belongs, is called Dhakka Bazu. In Gladwin's spelling 'Dukha Bazoo' it is, however, scarcely recognizable. Dhaka occurs in the Akbarnamah as an Imperial thanah in 1584; and Sir A. Phayre (*vide* above, p. 53) mentions it in 1400."

৩৭. এজন্য দেখা যেতে পারে, *Excavation at Wari-Bateshwar : A Preliminary Study*, Edited by Enamul Haque, Dhaka, 2001; *উয়ারী-বটেশ্বর : শেকড়ের সন্ধানে*, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, ঢাকা, ২০১২।

৩৮. *'ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন'* শিরোনামে শাহ্ মুহম্মদ নাজমুল আলম কর্তৃক অনূদিত, একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬৪।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪।

৪০. Compiled/contained in the *Affairs of the East India Company being the Fifth Report* from the Select Committee of the House of Commons 28th July, 1812, Vol. II., B. R. Publishing Corporation, Delhi, 2001, p. 344; অতঃপর The Fifth Report নামে উল্লিখিত।

৪১. *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১২৬।

৪২. শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "The reign of Jahangir forms a definite landmark in the history of Bengal. Under Akbar, Mughal rule in Bengal was more like an armed occupation than a settled administration...It was early in the reign of Jahangir that organised and effective steps were taken to crush all the independent zamindars and impose a uniform administrative system over the entire territory...The reign of Jahangir also witnessed the greatest extension of the political influence and authority and the territorial limits of the Mughal empire on the north-eastern frontier." [দেখুন, *The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period (1200—1757)*, p. 234].

৪৩. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, Translated by H. Beveridge, Low Price Publications, 2007, p. 1023.

৪৪. *Bengal District Gazetteers : Santhal Parganas*, L. S. S. O'Malley, p. 31.

৪৫. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, pp. 1042-3.

৪৬. *Raja Man Singh of Amber*, Rajiva Nain Prasad, The World Press Private Ltd., Calcutta, 1966, p. 91.

৪৭. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, p. 1213. আরও দেখুন, *কেদার রায়*, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চতুর্থ অধ্যায়।

৪৮. রাজা মানসিংহের আধুনিক জীবনীকার শ্রীরাজীব নাইন প্রসাদ যথার্থই বলেছেন, "Isa Khan was the most turbulent Afghan leader whom Raja Man Singh had to face. He was the craftiest and the ablest of all the contemporary Afghan chiefs of Bengal..." (দেখুন, Op. cit., p. 96).

৪৯. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, p. 1093.

৫০. *Raja Man Singh of Amber*, p. 102.

৫১. Ibid., p. 104.

৫২. p. 29.

৫৩. তাঁর মূল নাম আলাউদ্দিন। জাহাঙ্গিরের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি

'ইসলাম খান' উপাধি পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর পুরো নাম হয় ইসলাম খান চিশতি ফারুকি। প্রথমে তিনি ছিলেন বিহারের সুবাদার, তখন তাঁর মনসব ছিল ৫,০০০। জাহাঙ্গির কুলি খান লালা বেগের মৃত্যুর পর (জাহাঙ্গিরের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে) তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এখানে বিদ্রোহী আফগানদের দমনে সাফল্য দেখানোয় তাঁর মনসব ৬,০০০-এ উন্নীত হয়। (দেখুন *The Maathir-Ul-Umara*, Nawwab Samsam-ud-daula Shah Nawaz Khan & Abdul Hayy, Translated by H. Beveridge, Vol. 1, Low Price Publications, 1999, pp. 692-3).

৫৪. সংগৃহীত, *Raja Man Singh of Amber*, p. 91, see fn.

৫৫. দেখুন, *Waki'at-I Jahangiri*, compiled in *The Histroy of India as told by its Own Historians*, Sir H. M. Elliot and John Dowson, Vol. 6, Low Price Publications, 2008, p. 328.

৫৬. *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V., Trubner & Co., London, 1875, p. 120; *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. XI (Coondapoor to Wdwardesabad), 1908, p. 117.

৫৭. *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca*, B. C. (Basil Copleston) Allen, Pioneer Press, Allahabad, 1912, p. 2.

৫৮. *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 24.

৫৯. *History of the Portuguese in Bengal*, J. J. A. Campos, Janaki Prakashan, Patna, 1979, p. 88.

৬০. দেখুন, ইংরেজিতে অনূদিত তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৩-সংখ্যক টীকা; সংগৃহীত, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, মির্জা নাথান (মূল), অনুবাদ খালেকদাদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২০৭।

৬১. *Dacca : A Record of Its Changing Fortunes*, p. 31.

৬২. *ঢাকার ইতিহাস*, যতীন্দ্রমোহন রায়, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ২০০০, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬৩. *East-India Gazetteer*, Walter Hamilton, Low Price Publications, 1993, p. 477.

৬৪. দেখুন, *Travels in the Mogul Empire*, Francois Bernier, Translated by Archibald Constable-এ তৎপ্রদত্ত ৪-সংখ্যক পাদটীকাস্থ ব্যাখ্যা, p. 171.

৬৫. *Dacca : The Mughal Capital*, Abdul Karim, p. 14.

৬৬. আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবদুল করিমের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যেমন– শ্রীকেদারনাথ মজুমদার [*ঢাকার বিবরণ*, (ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ভুক্ত), পৃষ্ঠা ৫৭২, ৫৭৩]; শরীফ উদ্দিন আহমেদ (*Dhaka : A Study in Urban History and Development,*

1840-1921, Sharif Uddin Ahmed, Academic Press and Publications Ltd., Dhaka, 2003, p. 13); মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (*ঢাকার ইতিবৃত্ত : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃষ্ঠা ৩২); রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অধ্যাপক ইসলাম তো নিশ্চিত করে বলেই ফেলেছেন, ''ইসলাম খান ১৬১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ বা আগষ্ট মাসের শুরুতে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকার নতুন নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানীতে উন্নীত হয়।" (*ঢাকার কথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৫)। অবশ্য তিনি এতটা নিশ্চিত হওয়ার সপক্ষে কোনো উৎস বা সূত্র গ্রন্থিত করেননি।

৬৭. *Dacca : The Mughal Capital*, pp. 9-13.

৬৮. *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৬। প্রসঙ্গত এরূপ ধারা-বর্ণনা লক্ষগোচর হয় মির্জা নাথান রচিত *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* নামক এপর্বের বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে সুলিখিত, ঘটনার প্রায়শ প্রত্যক্ষ দর্শনজাত ও নির্ভরযোগ্য দরবারি ইতিহাসেও। তবে বিস্ময়কর হলেও সত্য, এর দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনায়ও ঢাকায় ঠিক কবে, কখন রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার উল্লেখ নেই।

৬৯. *The Maathir-Ul-Umara*, Vol. 1, pp. 692-3.

৭০. ইসলাম খানের বয়স (জাহাঙ্গিরের থেকে মাত্র ১-বছর কম) তুলনামূলকভাবে অল্প হওয়ায় দরবারের প্রভাবশালী আমির-ওমরাহগণ তাঁর নিয়োগে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গির সেসব উপেক্ষা করেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও পছন্দে তাঁকে সুবাদার পদে নিয়োগ করে বাংলায় প্রেরণ করে। কার্যত তিনি যে মোটেও ভুল করেননি, পরবর্তী ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। ইসলাম খান তাঁর নিয়োগকর্তার আস্থার বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন।

৭১. *The Romance of an Eastern Capital*, F. B. Bradley-Birt, Smith, Elder, & Co., London, 1906, p. 93.

৭২. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. XI, p. 117.

৭৩. মোগলযুগের বাংলা ও ঢাকা সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক Robert Orme কী বিমুগ্ধ, বিস্ময়কর উক্তি উচ্চারণ করেছেন, তা একবার দেখা যাক: "The province of Bengal is the most fertile of any in the universe, more so than Egypt, and with greater certainty... / The country about Dacca, where the Ganges disembogues itself by a hundred mouths into the ocean, is alone sufficient to supply the whole province of Bengal with rice: and every other part of the province, if duly cultivated, would produce exceedingly more than its occasions." (দেখুন তাঁর, *Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan*, Associated Publishing House, 1974, pp. 259-60).

৭৪. *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, পৃষ্ঠা ২৩।
আবদুল করিম নিশ্চিত করে বলেছেন, ইসলাম খান নিযুক্তির (মে ১৬০৮) মাত্র এক মাসের মধ্যে রাজমহলে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। (দেখুন তাঁর, *History of Bengal, Mughal Period*, Vol. I., Abdul Karim, p. 438).

৭৫. *তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি* সূত্রে জানা যায়, নিয়োগকালেই তাঁকে ৪,০০০ সওয়ার ও ৩,০০০ ঘোড়ার মনসব দেওয়া হয়েছিল। (দেখুন, *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, Translated by Alexander Rogers and edited by Henry Beveridge, Low Price Publications, 1989, pp. 142-44).

৭৬. *Waki'at-I Jahangiri*, Vol. 6, p. 327.

৭৭. ১০১৪ হিজরির ২০শে জমাদিউস-সানি মোতাবেক ১৬০৫ সালের ২৪শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবারে। (দেখুন, *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, p. 1; *History of Jahangir*, Beni Prasad, The Indian Press (Publications) Pvt., Ltd., Allahabad, 1962, p. 120).

৭৮. *Waki'at-I Jahangiri*, Vol. 6, pp. 327-8.

৭৯. Ibid., Vol. 6, p. 328.

৮০. *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, p. 209.

৮১. যে-কারণে ঢাকায় তাঁকে বিভিন্ন পাকা ও শক্ত ইমারত-স্থাপনাদি নির্মাণ করতে হয়েছিল। জেমস ফার্গুসন (James Fergusson) জানাচ্ছেন, "At the other end of his dominions also he built a splendid new capital at Dacca, in supersession to Gaur, and adorned it with several buildings of considerable dimensions. These, however, were principally in brick-work, covered with stucco, and with only pillars and brackets in stone." (দেখুন তাঁর, *History of Indian and Eastern Architecture*, Revised and edited by James Burgess & R. Phene Spiers, Low Price Publications, 1997, Book VII, Chapter X, p. 305).

৮২. *A Statistical Account of Bengal, Vol. V : Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*, p. 67. নতুন রাজধানীর নামকরণ রাজমহল থেকে তা স্থানান্তরের অব্যবহিত পরেপরেই, নাকি অনেককাল পরে করা হয়েছিল, তার কোনো সুস্পষ্ট ও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আমরা মনে করি, যেহেতু মোগলদের আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের প্রবণতাই ছিল সাধারণত নতুন কোনো স্থান বিজিত হলে এবং সেটিকে যদি রাজধানী বা অনুরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা অধিষ্ঠান করা হয়, তবে সেটি ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামেই করা, এটা তাঁরা সম্রাটকে যারপরনাই খুশী করবার মানসেই করতেন। সঙ্গত কারণে ধরে নেয়া যায়, ১৬০৮, ১৬১০ বা ১৬১২

সালে, যেটাই হোক না কেন, ঢাকাকে রাজধানী হিশেবে নির্বাচন ও স্থাপনের প্রায় শুরু থেকেই এই নামকরণ হয়েছিল। মধ্যে কেন্দ্রের অর্থাৎ সম্রাটের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে যেটুকু দেরী, তা হয়ে থাকবে। আমাদের এ-বক্তব্যের সমর্থনে এ-যুক্তি বা ব্যাখ্যাই যথেষ্ট যে, বস্তুত তিনি (ইসলাম খান) যখন কোথাও যুদ্ধাভিযানে সৈন্যপ্রেরণ বা স্বয়ং সসৈন্য যাত্রা করতেন তখন উদ্দিষ্ট স্থানের রাজ-রাজন্য, ভূস্বামী বা প্রধান শাসককে আত্মসমর্পণের জন্য যে পত্র লিখতেন, অথবা দিল্লিতে যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাঠাতে বা অন্য কোনো কারণে সম্রাটের সঙ্গে দূত মারফত পত্র যোগাযোগ করতেন, তখন প্রেরককর্তার নাম ও স্থান উল্লেখের প্রয়োজনে সুবার রাজধানী হিশেবে কোনো না কোনো নাম নিশ্চয়ই তাঁকে লিখতে হতো, আর সেটা তিনি করতেন নতুন রাজধানী 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ'-কে কেন্দ্র করেই। ফলে ধারণা করা অমূলক হবে না যে, ঢাকার 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ' নামকরণ এর রাজধানী হওয়ার প্রথম দিকেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। অবশ্য এর ভিন্ন মতও আছে। যেমন সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর লিখেছেন, "The Nawab (*Islam Khan Chishti*) landed in Dhaka in 1608 and after completely overpowering Pathan opposition and consolidating Moghal authority in Bengal, he formally renamed Dhaka as Jahangirnagar in 1612 in honour of his patron and liege." (দেখুন তাঁর, *Glimpses of Old Dhaka*, Syed Muhammed Taifoor, p. xxvi). এটা হওয়াও অসম্ভব নয়।

৮৩. *History of Bengal, Mughal Period*, Vol. I., p. 438.

৮৪. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18.

৮৫. p. 284.

৮৬. *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, Reprint, Edited by Sirajul Islam, Asiatic Society of Bangladesh, 2010, p. 51.

৮৭. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, p. 34.

৮৮. দেখুন, *The Islamic Heritage of Bengal* ভুক্ত তাঁর প্রবন্ধ 'Islam in Bengal', p. 33; *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)*, p. 150.

৮৯. দেখুন তাঁর, *Bengal under Akbar and Jahangir*, Tapan Raychaudhuri, p. 51.

৯০. p. 60.

৯১. পৃষ্ঠা ৭২। অবশ্য এটির সম্পাদক ভিন্ন মত (১৬০৮) প্রকাশ করেছেন। দেখুন ঐ, ভূমিকা।

৯২. Op. cit., p. 35.

৯৩. স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ...।' দেখুন, *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

৯৪. *Travels in India*, Jean-Baptiste Tavernier, Translated by V. (Valentine) Ball & edited by William Crooke, Low Price Publications, 2007, Book I, Chapter VIII, p. 102.

৯৫. *The Life of Mir Jumla : The General of Aurangzeb*, Jagadish Narayan Sarkar, Rajesh Publications, 1979, pp. 271-2.

৯৬. pp. 142-3.

৯৭. Ibid., pp. 149-50.

৯৮. Ibid., p. 151

৯৯. *Travels in India*, Book I, Chapter VIII, p. 104.

১০০. *Travels in the Mogul Empire*, Francois Bernier, Translated by Archibald Constable & revised by Vincent A. Smith, Low Price Publications, 1989, p. 181.

১০১. *Mogul India or Storia Do Mogor (1653-1708)*, Niccolao Manucci, Translated by William Irvine, Low Price Publications, 1996, Vol. II, p. 80.

১০২. ঢাকায় ইংরেজ কুঠি আনুমানিক ১৬৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্ভবত তা সরকারি অনুমোদন পায় আরও ২-বছর পরে (১৬৬৮)। ১৬৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারিতে হুগলী কর্তৃপক্ষকে লিখিত কোর্ট অভ ডিরেক্টরমণ্ডলীর একটি পত্র থেকে জানা যায়, ঢাকাকে তারা বাণিজ্যের জন্য তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। চিঠির ভাষায়, "Decca is a place that will vend much Europe goods, and that the best Cossaes *(কোষা)*, Mullmuls *(মলমল)* &c. may there be procured." (সংগৃহীত, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*, p. 150, see fn 2)। ১৬৭০ সাল থেকে এখানে ইংরেজ কুঠির কর্মতৎপরতা পূর্ণোদ্যমে চালু হয়েছিল। তখন কুঠি-প্রধান ছিলেন জন স্মিথ (John Smith)। এঁর পরে হয়েছিলেন রবার্ট এলওয়েস (Robert Elwes), স্যামুয়েল হার্ভি (Samuel Hervy) প্রমুখ। তবে শুরুর দিকে তাদের এ-কুঠি যে বাঁশ-খুঁটিতে তৈরী ও ছনে-খড়ে ছাওয়া এবং খুব সামান্য ইটের কাজই তাতে ছিল, তা ধারণা করা যায় এভাবে যে, এগুলোতে প্রায়ই আগুন লাগত। অবশ্য এসময় বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাটা ছিল নাকি ঢাকার একটা সাধারণ বা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! স্ট্রেনসাম মাস্টারের ডায়েরীতে এসম্পর্কে

কৌতূহলজনক বর্ণনা পাওয়া যায়, যার প্রাসঙ্গিক অংশ এরকম: "...the Company's house in Dacca is very streight and not capable to receive and secure the Honble. Company's goods by reason of severall thatcht hovells within and round about the compound which are very dangerous in respect of fire which often happens in Dacca. The Councell did therefore order that brick buildings be forthwith erected to secure the Company's Goods..." (সংগৃহীত, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*, Translated by Sir Richard Carnac Temple, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., Ltd., 1997, p. 151, see fn 2).

১০৩. মিরজুমলার যুগে ইংরেজদের তুলনায় ডাচদের কুঠিবাড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত। টাভার্নিয়ের লিখেছেন: "The Dutch, finding that their goods were not sufficiently safe in the common houses of Dacca, have built a very fine house..." (দেখুন, *Travels in India*, Book I, Chapter VIII, p. 105).

১০৪. *Mogul India or Storia Do Mogor*, Vol. II, p. 80.

১০৫. দেখুন, *I. Report on the Old Records of the India Office*, p. 92.

১০৬. *Nobility under the Great Mughlas-Based on Dhakhiratul Khawanin of Shaikh Farid Bhakkari*, Translated by Z. A. (Ziyaud-Din Abdul-Hayy) Desai, Sundeep Prakashan, 1st Published in 2003, p. 73.

১০৭. তিনি ১৬৬৪ সালের ৮ই মার্চ ৬৩ বছর বয়সে অর্থাৎ প্রায় বৃদ্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গিরনগরে তথা ঢাকায় এসে বাংলার সুবাদারি গ্রহণ করেছিলেন।

১০৮. *Travels in the Mogul Empire*, p. 179.

১০৯. তাঁর সম্বন্ধে সমকালীন ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া মার্টিন লিখেছেন, '...Dacca, the usual seat of residence for the Viceroy of Bengal...The Viceroy was Shaista Khan, uncle of the emperor Aurangzeb and a man of singular worth and ability.' [দেখুন, *India in the 17th Century (Social, Economic and Political), Memoirs of Francois Martin (1670-1694)*, Vol. I, Part II, Translated and annotated by Lotika Varadarajan, Manohar, 1983, p. 565].

১১০. Op. cit., p. 61.

১১১. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, p. 35.

১১২. *List of Ancient Monuments in Bengal* 1895, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1896, p. 198.

১১৩. শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখেছেন, ''এই সমুদয় কারণ বিবেচনা করিয়া দেওয়ান কারতলব খাঁ কাননগো ও খালসা বা রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীর সহিত

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মুখসুসাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কুলুড়িয়া নামক পতিত মৌজায় দেওয়ানখানা ও মহলসরা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দক্ষতাসহকারে দেওয়ানি কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।" (*মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩০৯, পৃষ্ঠা ৫৩০)।

১১৪. স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "*The name*,—We all know that when Murshid Quli (Jafar) Khan, the diwan of Bengal, removed the provincial revenue headquarters from Dacca to this place in 1704, it came to be called after him, *Murshidabad*, instead of its former name *Mukhsusabad*, or the Select City." (See, his article titled *Old Murshidabad : Historical Memories*, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস: প্রথম পর্ব গ্রন্থ ভুক্ত), পৃষ্ঠা ১০৯।

১১৫. দুটো নামই চলে। [দেখুন, *A Bengal District in Transition : Murshidabad, 1765-1793*, K. M. (Khan Mohammad) Mohsin, Asiatic Society of Bangladesh, 1973, p. 4].

১১৬. এসময় দিওয়ান হয়েছিলেন প্রথমে সৈয়দ আকরাম খান ও তাঁর মৃত্যুর পরে সৈয়দ রাজি খান, তাঁর মৃত্যুর পরে মির্জা আসাদউল্লা ওরফে সরফরাজ খান।

১১৭. ঢাকায় তাঁর পক্ষে প্রথম নায়েব-ই নাজিম বা ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন খান মুহম্মদ আলি খান।

১১৮. *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 22.